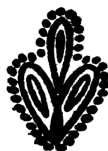
অন্য নগর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬০

তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩।

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম সাড়ে তিন টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী গৌরী মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কে

যে দুজন

'অন্য নগর'

প্রথম

শুনেছিলেন

আমার প্রথম উপন্যাস ‘অন্য নগরে’র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দিগন্ত পাবলিশার্সে'র পক্ষ থেকে কবি অজিত দত্ত প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আমার নাম তখন অপরিচিত এবং এই উপন্যাস কোন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় নি। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ‘অন্য নগর’ প্রকাশ করে কবি অজিত দত্ত আমাকে প্রতিষ্ঠালাভের যে সুযোগ দিয়েছিলেন আমার সাহিত্যিক জীবনে তার মূল্য অনেক। সে কথা স্মরণ করে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

। রচনাকাল।

১৩ই মে (শুক্রবার সকাল)

থেকে

২রা জুন (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা)

লণ্ডন, ১৯৪৯

এই লেখকের

এই মর্তভূমি (২য় সংস্করণ)

দূরের মিছিল (৩য় সংস্করণ)

মনে মনে (২য় সংস্করণ)

মুখর লণ্ডন (৩য় সংস্করণ)

ছায়া মারীচ (২য় সংস্করণ)

নতুন বাসর (২য় সংস্করণ)

ইভনিং ইন প্যারিস (২য় সংস্করণ)

জনসম্রাট

ব্যালেরিনা

দুর্গতোরণ (যন্ত্রস্থ)

বিপাশা (যন্ত্রস্থ)

পিকাডিলি থেকে লেস্টার স্কোয়ার মিনিট পাঁচ-সাতের পথ। লোকে সাধারণত টিউব নেয় না, বাসেও চড়ে না, ওটুকু পথ হেঁটেই চলে যায়।

আরও নানা আকর্ষণ এখানে জনসাধারণের কৌতূহল জাগায়। এ অংশটুকু হলো লণ্ডনের হৃৎপিণ্ড। তাই সব সময় এখানে হাজার বিদেশীর ভিড়। ইংল্যাণ্ডের নানা স্থান থেকে যারা আসে এখানে দাঁড়িয়ে তাদের মাথা ঘুরে যায়। অ্যামেরিকান ট্যুরিস্টরা হাঁ করে ইরসের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। ফরাসী কিংবা ভারতীয় অথবা কন্টিনেণ্টের অন্যান্য আগন্তুক এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকে।

কিন্তু ওই একবারই। বড়োলোক না হলে দ্বিতীয়বার এ পাড়ার রেস্তোরাঁয় আর কেউ যায় না। দাম এতোই বেশি। তাই এই ওয়েস্ট-এণ্ডের দামী হোটেলগুলিতে সব সময় অনেক জায়গা খালি থাকে।

রাস্তায় হাজার লোকের ভিড় থাকলেও এতোটুকু শব্দ নেই। রাস্তায় বড়ো একটা কেউ কথা বলে না। চোখে পড়ে নানা বয়সের নানা রকম লোক রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছে চুপ করে। পাশের সঙ্গীর সঙ্গে হয়তো তারা মাঝে-মাঝে কথা বলছে, কিন্তু এতো আস্তে যে পাশের সঙ্গীটি শুনতে পাচ্ছে কিনা বোঝা কঠিন।

শুধু মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে কথা বলে বিদেশীরা। বলেই কিন্তু

তারা ভুল বুঝতে পারে। পাশের লোকগুলো অবাক হয়ে তাকায় তাদের দিকে।

তাই নানা দিক থেকে প্রথম প্রথম বিদেশীদের লণ্ডনে এসে বেশ অসুবিধা হয়। মনে হয় কলের পুতুলের প্রাণহীন রাজ্যে কে যেন তাদের ছেড়ে দিয়েছে।

আরও অবাক হয় তারা গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে। হাজার হাজার গাড়ি চলছে কিন্তু একবারও হর্ন বাজছে না। ট্র্যাফিক সিগন্যালের সংকেতে যথারীতি একটির পিছনে আর-একটি চলেছে।

সিনেমা হাউসের সামনে লম্বা 'কিউ' করে কতো লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মুখে যেন তাদের চাবি দেয়া। শুধু গাড়ির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারপাশ ঝকঝকে-তকতকে— দেখলেই বোঝা যায় লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ।

লেস্টার স্কোয়ার টিউব স্টেশনের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে লম্বা রাস্তা—চেয়ারিংক্রস্ রোড। এই রাস্তায় যেখানে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'ইণ্ডিয়া গ্রীল্', তার সামনে পথিকের দল অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে যখন গ্রীলের দরজা খোলা থাকে, তখন ভেতর থেকে ভেসে আসে দেয়াল-ফাটানো হাসি, নানা তর্ক-আলোচনার খণ্ড। লোকে কৌতূহলী হয়ে ভেতরে উঁকি মারে। দেখা যায় সেখানে ভারতীয়ের ভিড়। ব্যাপার বুঝতে পেরে তারা মনে মনে হেসে চলে যায়। বিদেশী না হলে সব সময় অমন প্রাণ খুলে হৈ-হল্লা করবে কে!

লণ্ডনের প্রায় প্রত্যেক রেস্তোরাঁর বাইরে 'মেনু' ঝোলানো থাকে। তাতে খদ্দেরের সুবিধা হয়। দাম জেনে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু এখানে কিছুই নেই। শুধু বড়ো

বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে, ইণ্ডিয়া গ্রীল। তার নিচে একটু ছোটো অক্ষরে লেখা রোজ রাত্তির বারোটা অবধি এই রেস্তোরাঁ খোলা থাকে।

সেটা একটা মস্ত সুবিধা বইকি। দশটার পর কপাল ভালো হলে হয়তো দু-একটা রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া যায়। সিনেমা কিংবা থিয়েটার দেখে বেরিয়ে ক্ষুধার্ত দর্শক বেশির ভাগ রেস্তোরাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে লেখা রয়েছে, ক্লোজড্। তখন হতাশ হয়ে হুড়মুড় করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তারা ঢুকে পড়ে এই ইণ্ডিয়া গ্রীলে। কাজেই খদ্দেরের অভাব নেই ভূপাল মল্লিকের। মাসে মাসে মোটা টাকা নিয়মিত সে বাড়িতে পাঠায়।

অন্যান্য রেস্তোরাঁর তুলনায় দাম প্রায় দ্বিগুণ হলেও কারি-রাইসের লোভে অনেক ইংরেজ আসে ইণ্ডিয়া গ্রীলে। ভারত-ফেরত ইংরেজরা মাঝে মাঝে মাতব্বরি চালে বলে ভূপালকে, বড়ো বেশি দাম নিচ্ছ মালিক, ভারতবর্ষে যখন ছিলাম এক টাকায় এর ডবল খেয়েছি—

হেঁ হেঁ, হাত কচলে ভূপাল উত্তর দেয়, আমাদের দেশের সঙ্গে এ দেশের খরচের তফাত জানেনই তো স্যার—

ইংরেজ গুবগুব করে মাংস-ভাত খেয়ে যায়, আর কথা বলে না। কিন্তু সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় বলে ভূপাল, বেশি দাম তো আসিস কেন বেটারা! তোদের মতো খদ্দেরের থোড়াই ধার ধারি আমি, আমার দেশের লোকই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে—

ঠিক বলেছেন মল্লিক সাহেব, পাশে দাঁড়িয়ে রতন সায় দেয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। লণ্ডনে এখন বহু ভারতীয়। তারা সকলেই

এই ইণ্ডিয়া গ্রীল খুঁজে বের করেছে। আর কারি-রাইসের যতোই দাম নিক না কেন ভূপাল, তারা তো আসা কমায় নি, বরং বাড়িয়েছে। ফলে বিদেশী খদ্দের আসুক না আসুক ভূপাল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রতন, মেরী আর আইলীন,—এরা করে পরিবেশন। রান্না করে মকবুল, মেহের আলি, বিপিন, যোগাড় দেয় রিচার্ড—মাদ্রাজী খ্রীষ্টান। আর বাসন মাজে ষাট বছরের বুড়ি রোজ আর ঠোঁট-কাটা, ভুরু-কুচকানো ট্যারা জার্মান মেয়ে ফ্রিডা। হিসেব দেখে ভূপাল নিজে, আর মাঝে মাঝে খদ্দেরকে খাতির-যত্ন করে। দরকার হলে নিজেও হন্তদন্ত হয়ে পরিবেশন করতে দ্বিধা করে না।

এই নিয়েই লেস্টার স্কোয়ারে ইণ্ডিয়া গ্রীল। কোনো গোলমাল নেই, সবাই মনের সুখে দিব্যি মিলেমিশে আছে। সবাইকে নিয়ে ভূপাল ভারি খুশি।

প্রথম প্রথম মেরী আর আইলীনকে নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হতো। কিন্তু আজকাল ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে সহজেই মনের ভাব বুঝিয়ে দিতে পারে রতন আর ভূপাল। আর ওদেরও ইণ্ডিয়ানদের ইংরেজী শুনে-শুনে এখন কান ঠিক হয়ে গেছে—চট করে বুঝে নেয় যে ওরা কী বলতে চায়। আর 'রসগোল্লা', 'সন্দেশ'—এ কথাগুলোও বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে মেরী আর আইলীন।

মেরী রেস্তোরাঁয় আসে সকাল দশটা সাড়ে দশটায়। তার কিছু আগে আসে রান্না করবার লোকেরা। কিন্তু তাদেরও আগে রেস্তোরাঁয় বসে থাকে ভূপাল আর আইলীন। দুজনে মিলে

ব্রেকফাস্ট তৈরি করে এর মধ্যেই খাওয়া সেরে নেয়। ভূপালের গ্রীলে খদ্দেরের জন্তে ব্রেকফাস্ট কিংবা বিকেলবেলা চায়ের বন্দোবস্ত থাকে না। শুধু লাঞ্চ আর ডিনার। লাঞ্চ খাবার রীতি তুপুর একটা হলেও পৌনে বারোটা থেকেই খদ্দের আসতে আরম্ভ করে, আর তার জের চলে তুপুর তিনটে অবধি। নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না তখন। লাঞ্চের হাঙ্গামা চুকতে না চুকতেই সাড়ে পাঁচটা থেকে আসতে আরম্ভ করে ডিনারের খদ্দের। ব্যস, তারপর রাত বারোটা অবধি প্রত্যেকে নিশ্চিন্ত।

রবিবারেও খোলা থাকে ইণ্ডিয়া গ্রীল। তবে রবিবারের লণ্ডন দেশের হরতালের মতো। চারপাশ নিঝুম। খদ্দেরেরও ভিড় থাকে না সেদিন। তাই ভূপাল আর আইলীন চালিয়ে দেয় পরিবেশনের কাজ। রান্না করবার লোক শুধু একজন আসে সেদিন। আর সকলের ছুটি।

রাত্তির বেলা বন্ধ করবার আগে চাদর তুলে চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর তুলে রাখে ওরা। তাতে ঘর পরিষ্কার করবার সুবিধা হয়। পরদিন সকালে তুজনে মিলে ভালো করে ঘর ঝাড় দেয়, টেবিলের ওপর থেকে চেয়ার নামিয়ে টেবিল সাজায়। ফুলদানের ফুল অনেকদিন থাকে এদেশে, কাজেই বদলাতে হয় না রোজ রোজ। ছুরি, কাঁটা, চামচ, অ্যাশট্রে এনে ওরা ভরিয়ে দেয় টেবিলগুলি একে একে। আর ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় ভূপাল নিজেই দরজায় পিচবোর্ডের ছোটো ফলক 'ক্লোজড্' উলটে 'ওপ্ন' করে দেয়।

অসময়ে অনেক বাঙালী ছাত্র দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে। ছুটে আসে ভূপাল তাদের কাছে। যদিও এখন ভালো

কিছু নেই, তবু দেশের ছেলে আপনারা, এসেই যখন পড়েছেন, শুধু মুখে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না আপনাদের। কী চাই বলুন ?

ভাত-মাংস পাওয়া যাবে নাকি ?

কিছু হয় নি স্যার এখনও, টু আর্লি আপনারা। রসগোল্লা খান না, ভালো সন্দেশ দেব ?

তাই দিন।

ছুটে গিয়ে ভূপাল বড়ো বড়ো প্লেটে ছোটো ছোটো রসগোল্লা আর পুরানো পয়সার মতো সন্দেশ নিয়ে আসে, আর কিছুই নেই এখন স্যার—সরি।

বাঙালী খদ্দের এলে বিশেষ ব্যস্ত না থাকলে আইলীন এসে প্রায়ই গল্প জুড়ে দেয় তাদের সঙ্গে, ছাত্র বুঝি ?

হ্যাঁ।

নতুন এসেছো ?

হ্যাঁ।

সকলে একসঙ্গে এসেছো নাকি ?

আরে না না, একটা রসগোল্লা মুখে পুরে একজন বলে, আমি আছি তিন বছর।—তোমার নাম কী ?

আইলীন।

বাঃ আইলীন, সুন্দর রসগোল্লা কিন্তু তোমাদের।

আর একজন বলে, সন্দেশও ভালো।

আমাদের সবকিছুই ভালো, হেসে বলে আইলীন। তুমি তিন বছর আছো। অথচ তোমাকে আগে এ রেস্তোরাঁয় তো কখনও দেখি নি।

আমি লণ্ডনে থাকি না কিনা—

কোথায় থাকো ?

শেফিল্ডে।

ও, কিন্তু লণ্ডনে এলেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসো এখানে।

এই তো এসেছি, রসিকতা করে বাঙালী ছাত্র।

তুটি তুটি করে রসগোল্লা আর সন্দেশ খায় ওরা। সবসুদ্ধ ওরা তিন জন। বিল দেয় ভূপাল বারো শিলিং-এর অর্থাৎ আট টাকার। তাছাড়া আবার আলাদা টিপ্‌স।

বাইরে বেরিয়ে ছেলেরা বলে, খুব হয়েছে, আর খাবে লণ্ডনে সন্দেশ আর রসগোল্লা ?

জীবনে আর ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ নয় বাবা।

কে বলে বাঙালীর ব্যবসায় মাথা নেই।

লণ্ডনে এসে মাথা খুলেছে।

মাথা আছে বৈকি ভূপালের—ব্যবসায় বেশ মাথা আছে তার। সে জানে সন্দেশ রসগোল্লা ভাত না খেয়ে কতোদিন আর বিলেতে থাকতে পারে বাঙালী! আর বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে! ভূপালকেও তারা রেখেছে বৈকি—রাজার মতো সুখে রেখেছে।

মাঝে মাঝে ছোটোখাটো গোলমালও বাধে বইকি রেস্তোরাঁয়, কিন্তু তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না ভূপাল। শান্ত হয়ে চুপেচাপে চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাতে তার তু-চার পাউণ্ড অর্থদণ্ড গেলেও সে গ্রাহ্য করে না কিছু। বড়ো ঠাণ্ডা মাথা ভূপালের।

হয়তো একদিন সকাল বেলা সকলে আসবার আগে 'ক্লোজড্'

দরজা ঠেলে ঢুকলো এক ইংরেজ। ছেঁড়া ওভারকোট তার গায়ে, ময়লা জুতো, দাড়ি কামায় নি ছুদিন।

ভূপালের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললো, গুডমর্নিং!

গুডমর্নিং, কী চাই আপনার?

মিঃ মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমিই মল্লিক।

ও, আরে তাই নাকি? আমার নাম বিল—তোমাদের মেরীর স্বামী।

বোসো বোসো বিল, বড় খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে।

সেলাম ইণ্ডিয়ান, যুদ্ধের সময় তোমাদের দেশে ছিলাম কিছুদিন। বড়ো সুখে ছিলাম।

চা খাবে বিল?

না মালিক, ধন্যবাদ। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে পারি কি?

নিশ্চয়ই।

মেরী বলতে পারে নি তোমাকে—আমাদের বিশেষ দরকার, তিন পাউণ্ড তার মাইনে থেকে যদি আগাম দাও—

এখুনি দিচ্ছি, ভূপাল ড্রয়ার খুলে পাউণ্ডের তিনটি নোট গুঁজে দিল বিলের হাতে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিল বেরিয়ে গেলো।

মেরী এসে সমস্ত শুনে চিৎকার করে উঠলো, এসেছিলো—এখানেও এসেছিলো? চোর! ওকে পুলিসে দাও মালিক। সারাদিন পরিশ্রম করি ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে, লজ্জা করে না ওর আমার টাকা এমনি করে চুরি করতে! আমি ওকে ডিভোর্স করবো—

আহা হা, রাগ কোরো না মেরী, ঘাবড়ে গিয়ে বলে ভূপাল, দোষ আমার। আমার উচিত ছিলো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে তুমি এলে তোমার মত নিয়ে ওকে টাকা দেয়া···

আমার সামনে তোমাকে টাকার কথা বলতে সাহস পাবে ও? একটা পাঁড় মাতাল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে ওর? আমার সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের টাকা—

যাকগে যাকগে, আমার সমস্ত দোষ। ওর জন্যে ভেবো না তুমি মেরী, আমি আবার দেবো তোমাকে ওই টাকা।

ডিভোর্স করবো মাতালটাকে আমি। দাঁড়াও না, আজ বাড়ি গিয়ে আমি মজা দেখাচ্ছি ওর···

অনেক কষ্টে মেরীকে শান্ত করে ভূপাল।

কিন্তু পরদিন সকালে ঠিক সেই সময় আবার ফিরে এলো বিল। ভূপালকে দেখে হেসে হাত তুলে বললো, সেলাম ইণ্ডিয়ান! কী কাণ্ড করে আমার পাগলী স্ত্রী বলো তো? সকালে বললো তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতে আর রাত একটায় ঘুম থেকে তুলে আমাকে বলে আজ সকালে তোমাকে টাকা ফেরত না দিয়ে গেলে ডিভোর্স করবে আমাকে। নাও মালিক তোমার টাকা। ও ডিভোর্স করলে বড়ো অসুবিধা হবে আমার—

মেরী আসতেই ভূপাল বললো, তোমার স্বামী টাকা ফেরত দিয়ে গেছে আজ সকালে—

কি? লাল হয়ে গেলো মেরীর সমস্ত মুখ, কত বড়ো বদমাশ দেখ! অথচ কাল আমার কাছে কিছুতেই স্বীকার করলো না যে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে—

আইলীন ফিক করে হেসে ফেললো। ভূপাল কী করবে ভেবে

না পেয়ে একবার মেরীর আর একবার আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে হিসেবের খাতাটা টেনে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

কিন্তু পরের দিন ভূপালের ঘাড়ে হাত রেখে বললো মেরী, আমার একটা কথা শোনো মালিক ডিয়ার, বিল বড়ো সরল লোক। শুধু নেশা করলে জ্ঞান থাকে না—এই যা দোষ। তবে ভালোবাসে আমাকে খুব। আজকালকার দিনে ক-জন স্বামী এমন হয়?

ভূপাল বলে, তা বইকি মেরী।

মাঝে মাঝে এমনি আরও অনেক ঘটনা ঘটে। সব দিকেই চোখ রাখতে হয় ভূপালকে। লণ্ডনের মতো শহরে একটা রেস্তোরাঁ চালানো কি সোজা কথা! ভূপাল নিজেই বাহাদুরি দেয় মনে মনে।

একবার একজন অল্পবয়সী মেয়ে এসেছিলো এখানে কাজ করতে। সকলেরই চোখ পড়েছিলো তার ওপর। কিন্তু তখন প্রথম প্রথম, কেউ বেশি এগোতে সাহস পায় নি। শুধু সেই যোগাড়ে মাদ্রাজী খ্রীষ্টান রিচার্ড হঠাৎ একদিন খপ করে মেয়েটির হাত ধরে বলেছিলো, আই লাভ ইউ—

আর যাবে কোথায়! তখুনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো মেয়েটি। যাবার আগে বলে গেলো, ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে আর জীবনে নয়, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না ওরা।

রিচার্ড বেচারা ইংরেজ মেয়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করে নি। লজ্জা পেয়ে ভেবে পেলো না কী করবে।

কর্তব্যের খাতিরে রিচার্ডকে ডেকে ভূপাল মিষ্টি করে কঠিন উপদেশ দিলো, একটু বুঝেশুনে কাজ করবে। রেস্তোরাঁর এরকম দুর্নাম হলে বিদেশী হয়ে এদেশে আমি ব্যবসা চালাবো কেমন করে?

আর জানোই তো এখন ওয়েট্রেস্ পাওয়া কি রকম শক্ত। বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছে করো, আমি একটি কথাও বলবো না।

আমি খুব দুঃখিত, ভূপালের কাছে মাপ চাইলো রিচার্ড।

সে চলে গেলে আপন মনেই বললো ভূপাল, হাত ধরেছে তো জাত গেছে, ইংরেজ মেয়ের আবার সতীত্ব—আর কত রঙ্গ দেখাবে মা!

আর-একটা কথা মনে করলে একটু দুঃখ হয় ভূপালের। অতোটা কঠোর না হলেই হতো হরির ব্যাপারে। আসলে কিন্তু দোষ কিছুই ছিলো না হরির। তবু রিচার্ডের ঘটনার পর একটু বেশি সতর্ক হয়ে পড়েছিলো ভূপাল। সবচেয়ে আগে তার রেস্তোরাঁর সুনাম। না হলে ইণ্ডিয়ানদের ওপর কী ধারণা হবে বিদেশীদের?

হরি যখন চাকরি করতো এখানে, ডরোথিও ছিলো তখন। তিন ছেলের মা ডরোথি, স্বামীও বেঁচে আছে। খুব ভালো মেয়ে। ভূপালেরও বড়ো মায়া পড়েছিলো তার ওপর। সে লক্ষ্য করতো হরি প্রায়ই তার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করে। দেশের ছেলে হরি, তাই তাকে ডেকে বার বার সাবধান করে দিলো ভূপাল, মনে রেখো হরি, বিয়ে হয়ে গেছে ওর। তিন ছেলের মা। একটু এদিক-ওদিক হলে যদি ফস করে চাকরি ছেড়ে চলে যায় তাহলে মহা মুশকিলে পড়বো আমি—

কিন্তু কে শোনে কার কথা! শুক্কুরবার রাত্তির দশটায় ছুটি নিয়ে হরি আর ডরোথি একসঙ্গে তারই চোখের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো। পরদিন হরি এলো যথাসময়ে কিন্তু ডরোথি এলো না।

ডরোথি কোথায়? গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভূপাল।

আমি কেমন করে জানবো ?

আরও গম্ভীর হয়ে ভূপাল বললো, বুঝেছি। অনেকবার তোমাকে সাবধান করেছি হরি, কিন্তু—যাকগে মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি, চলে যাও, আজ থেকে আর চাকরি করতে হবে না তোমাকে।

ডরোথি এলো দিন তিনেক পর।

অসুখ করেছিলো, খবর দিতে পারি নি মালিক—

ভূপাল বললো, আমি ভেবেছিলাম ইণ্ডিয়ানদের ওপর রেগে তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে বুঝি ?

ওমা, রাগবো কেন ?

হরি খারাপ ব্যবহার করেছে না তোমার সঙ্গে ?

না তো। সুন্দর ছেলে হরি। কোথায় সে ?

তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি।

কেন ? কী ব্যাপার খুলে বলো তো শুনি ?

কিন্তু বলবে আর কি ভূপাল। সে-ই সমস্ত শুনলো ডরোথির কাছে। ডরোথি বললো, হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো বটে তার ঘরে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? খুব ভালো লাগে আমার হরিকে। সে-রাত্তিরে হরি আমাকে বলেছিলো, আজ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে ভূপাল রেগে গেছে। তোমাকে ভূপাল খুব পছন্দ করে ডরোথি। ঠিকই বলেছিলো হরি।

কে বুঝবে মেয়েদের মন! এবার ভূপালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চাকরি ছেড়ে দিলো ডরোথি। ভুল করে বইকি ভূপাল। কোন মানুষই বা থেকে-থেকে ভুল না করে ? সেকথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ভূপাল।

শনিবার রাত্তিরে রতন বললো, মল্লিক সাহেব, এবার বাইরের দরজার 'ওপন'টা উলটে 'ক্লোজড' করে দি?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভূপাল বললো, এখনও বারোটা বাজতে প্রায় কুড়ি মিনিট বাকি—

তা হোক, আবার নতুন খদ্দের এলে দিতে-থুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না?

আর একটু থাক, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন অতো? তুই-ই তো টিপস. পাবি বাবু আরও—

লাস্ট টিউবে বাড়ি যাই, সেটা মিস করলে কী অবস্থা হবে বোঝেন তো?

আচ্ছা আচ্ছা, দে ক্লোজড করে, বড়ো কথা বলতে শিখেছিস আজকাল তুই।

খাওয়া-দাওয়া সুযোগ বুঝে একসময় সেরে নিয়েছে রতন। এইবার গরম জলে মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা আর একবার ভালো করে বেঁধে নিলো। রেস্তোরাঁ একেবারে খালি, আর কোনো খদ্দের নেই এখন।

রতনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আইলীন বললো, এতো গম্ভীর মুখ কেন তোমার রটন্?

তুমি আমার সঙ্গে একদিনও বাইরে যেতে চাও না বলে।

এই ঠাণ্ডায় কেমন করে বাইরে যাবো?

হেসে রতন বললো, তাহলে আমার ঘরে চলো।

আইলীনও হাসলো, অনেক দূর যে।

ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবো।

হুঁ ? এতো পয়সা তোমার ?

মেয়ে-বন্ধু নেই কিনা, তাই পয়সা থাকে।

বেচারী রটন্ !

রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁকলো ভূপাল, কিরে রতন, এখন লাস্ট টিউব মিস করবার কথা মনে হয় না যে ?

হেসে ফিসফিস করে বললো রতন, মল্লিকের হিংসে হচ্ছে আইলীন।

আইলীনও হেসে বললো, খুব স্বাভাবিক।

গুড নাইট, আইলীনের হাত চেপে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো রতন।

একে একে বেরিয়ে গেলো ইণ্ডিয়া গ্রীলের সকলেই। অনেকবার অনেকের মুখ থেকে শুধু ভেসে এলো একটি কথা, গুড নাইট।

সবাই চলে যাবার কিছু পরে বাকি কাজ সেরে আলোগুলো পর পর নিবিয়ে দিলো ভূপাল। তারপর আইলীনকে নিয়ে নিচে নিজের ঘরে চলে এলো। গ্যাস জ্বালিয়ে বিছানায় আইলীনের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, খুব ক্লান্ত নাকি ?

না, তুমি ?

একটু—সকাল থেকে রাত্তির অবধি যা পরিশ্রম করতে হয় !

বেচারী ভূপাল, সিগ্রেট বের করে আইলীন বললো, খাবে ?

আমি সিগ্রেট খাই ?

সিগ্রেট খাও না, মদ খাও না—আশ্চর্য মানুষ তুমি।

আমাদের দেশে খারাপ লোকেরা মদ খায়।

ভূপালের কাঁধে মাথা রেখে আইলীন বললো, তুমি খুব ভালো লোক।

আর তুমি খুব ভালো মেয়ে।

হেসে আইলীন বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে ভূপাল।

ঘুমোও।

তোমার ঘুম পায় নি?

তাড়াতাড়ি হাই চেপে ভূপাল বললো, না।

তাহলে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

বেশ।

সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে আইলীন বললো, বড়ো রোগা হয়ে যাচ্ছো, একটু বিশ্রাম করা দরকার তোমার ভূপাল।

হেসে ভূপাল বললো, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই আইলীন।

কেন?

ব্যবসা দেখবে কে?

রতন। খুব বুদ্ধিমান লোক ও। ওর ওপর গ্রীলের ভার দিয়ে তুমি কোথাও ঘুরে এসো।

একটু গম্ভীর হয়ে ভূপাল বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি আইলীন?

হুঁ হুঁ।

রতনকে তুমি খুব বেশি পছন্দ করো, না?

হ্যাঁ, খুব বেশি।

আমার চেয়েও বেশি?

হেসে বললো আইলীন, কেন, তোমার হিংসে হয় বুঝি?

আমি তোমাকে ভালোবাসি আইলীন!

আমি জানি।

কিন্তু সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

তুমি সেকথা জানো না ভূপাল?

জানি।

তাহলে বার বার এক কথা জিজ্ঞেস কর কেন?

আমার কেবলই ভয় হয় যে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে—

যা-তা বোকো না।

বলো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না?

না।

কখনও না?

কখনও না।

তোমাকে না হলে আমার একদিনও চলবে না আইলীন, আমি বাঁচতে পারবো না, ভূপাল আইলীনের আরো কাছে সরে এলো।

অনেক রাত্তিরে আইলীন ঘুমিয়ে পড়বার পর ভূপাল আস্তে আস্তে উঠে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবে। তারপর ড্রয়ার থেকে চিঠি লেখবার কাগজ বের করে সেই রাত্তিরেই স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসে। দিনের বেলা সময় হয় না তার। ভূপাল লেখে—

প্রিয়তমে সুখদা,

এ মাসে তোমাদের এক হাজার টাকা পাঠাইয়াছি, আশা করি পাইয়াছ। শীঘ্রই আরও পাঠাইতে চেষ্টা করিব। এই বৎসরের শেষের দিকে কয়েক মাসের জন্য দেশে যাইতে পারি। পূজার বাজনা শুনিতে বড়ো সাধ হয়। আশা করি তোমার শরীর বেশ

সুস্থ আছে। বড়ো খুকী ছোটো খুকী ন্যাড়া পটল বুড়ো—ইহারা কেমন আছে? সব সংবাদ জানাইয়া চিন্তা দূর করিবে—

এতোটা লিখে ভূপাল ভেবে পায় না আর কী লিখবে। খোলা কলম হাতে নিয়ে ঘুমন্ত আইলীনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আর নিঃশব্দে রাত বেড়ে চলে।

তবু কিছুতেই ঘুম আসে না ভূপালের।

২

থাঁটি ওয়েস্ট এণ্ড যেমন পিকাডিলি, তেমনি আসল ইস্ট এণ্ড হলো অল্ডগেট। লণ্ডনের অপরিচ্ছন্ন নগণ্য দীন পল্লী। হাড়-বের-করা জীর্ণ বাড়িগুলি যেন কোনো রকমে টিকে আছে। দিন-মজুরের ছেলেমেয়েরা সারাদিন চিৎকার করে রাস্তায় খেলা করে। আর মাঝে মাঝে ভেসে আসে ভ্যাপসা গন্ধ।

এ পাড়ার লোকের মুখের কোনো বাঁধন নেই। গভীর রাত্তিরেও মাতালের দল গান গেয়ে বেড়ায়। চেহারা দেখলেই তাদের অবস্থা বোঝা যায়। আদব-কায়দা ভদ্রতা-বিনয়ের ধার ধারে না এরা। দরকার মনে করলে রাস্তায় ঘুষোঘুষি করতে ইতস্তত করে না। মেয়েদেরও মুখ দেখলে বোঝা যায় যে তারা এ পাড়ার মেয়ে। রাত্তিরে তাদের শাণিত কণ্ঠস্বরে প্রায়ই গৃহস্থের তন্দ্রা ভাঙে।

না বললেও চলে এ পাড়ায় গরিবের বাস। অল্প ভাড়ায় গোটা বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট অথবা ঘর সহজেই পাওয়া যায়। জিনিস-পত্রের দাম ওয়েস্ট এণ্ডের দোকানগুলির তুলনায় অনেক কম। সাধারণত অল্ডগেটে বাস করে কাগজের হকার, ফলওয়ালা, কুলি-মজুর আর গরিব ইণ্ডিয়ানের দল।

সেই সব ভারতীয়, যারা এসেছিলো টাকা রোজগার করতে, ছোটোখাটো ব্যবসা খুলতে কিংবা জাহাজের খালাসী হয়ে, কিন্তু নানা কারণে যারা আর দেশে ফিরে যেতে পারে নি, এদেশেই সংসার পেতেছে, তারা অনেকে মিলে ভাড়া নিয়েছে একটা পুরানো

বাড়ি। চাঁদা করে বাজার করে, পালা করে রান্না করে, ঝগড়া-তর্ক করে, তারপর আবার মিটমাট করে সুখে দিন কাটিয়ে দেয়। যদি এমনি করে না থাকতো, তাহলে লণ্ডনে হয়তো ওদের উপোস করে মরতে হতো। কিন্তু এখন ওরা প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত। যদি অনেক সপ্তাহ কারুর আয় একেবারে বন্ধ থাকে তাহলেও কিছু যায় আসে না। ওরা ভাগাভাগি করে চাঁদা করে চালিয়ে দেয়।

ঘরগুলোতে আর এতোটুকুও জায়গা নেই। চারপাশে জমা ভাঙা ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া কম্বল, খবরের কাগজের স্তূপ, নোংরা জুতো, ময়লা মোজা আর নানা জিনিস। তার ওপর মাঝে মাঝে অতিথি আসে। তখন শীতকাল হলেও এরা মাটিতে পুরু বিছানা করে নেয়। যারা এখনও জাহাজে চাকরি করে তারা এখানে আসে ছুটি কাটাতে। মদ টানে, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে। তারপর ছুটি ফুরোলে আবার ফিরে যায় বন্দরে।

রাত বারোটার অনেক পরে শেষ টিউবে রতন বাড়ি এসে পৌঁছলো। চারপাশ ঘন কুয়াশায় অন্ধ ডাইনীর মতো ভগ্ন জানু নিয়ে যেন তীব্র মাদকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে রতন সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো। কাঠের দুর্বল সিঁড়ি তার পায়ের চাপে তীব্র আর্তনাদ করতে লাগলো যেন। নিজের ঘর খুলে আলো জ্বেলেই চমকে উঠলো রতন—কে যেন শুয়ে আছে তার খাটে।

কিরে রতন এলি? চোখ খুলে বিষ্টু বললো, জাহাজ সারানো হচ্ছে লিভারপুলে, মাসখানেক ছুটি—

আরে বিষ্টুদা যে, আমি তো চমকে উঠেছিলাম।

বোস বোস রতন, বিষ্টু খাটের ওপর বসে কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলো।

ওভারকোট খুলে দরজার হুকে টাঙিয়ে রাখলো রতন। তারপর চেয়ারে বসে বললো, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

হ্যাঁ, খাতির খুব করেছে তোর বন্ধুরা, এক পেট খাইয়ে তবে ছাড়লে।

বাঃ, একটা সিগ্রেট বিষ্টুকে দিয়ে বললো রতন, তারপর কেমন আছো বলো বিষ্টুদা?

আছি ভালোই, তুই কেমন আছিস রতনা বল?

ভালোই, বড়ো হাই চেপে বললো রতন।

বিষ্টু বললো, চেহারাটা বেশ হয়েছে তোর, এবার একটা বিয়া-সাদি কর—

হেসে বললো রতন, দাও না একটা দেখে—

বন্ধু পাস নাই এখনও?

কই আর!

এদেশে সবাই তো পায় রে রতনা, যার বউ সে নিজেই খুঁজে নেয়।

রতন বললো, কপাল মন্দ আমার!

হোটেলে মেয়ে নাই তোর?

আছে।

তাদের ধর না একটারে।

না বিষ্টুদা, হেসে বললো রতন, ভালো লাগে না তাদের আমার।

পছন্দমতো মেয়ে পাওয়া মুশকিল রে রতনা, একটু গম্ভীর হয়ে বললো বিষ্টু, পারলে লিভারপুলের মেয়ে বিয়া করিস—

কেন ?

বড়ো সৎ হয় ওরা রে।

আর আমাদের দেশের মেয়ে ?

তুড়ি মারতে মারতে হাই তুলে বিষ্টু বললো, হ্যাঁ সৎ বটে, তবে বড়ো ঠাণ্ডা। এদেশের মেয়েদের তাপ মাথা খারাপ করে দেয় রে রতনা !

রতন হেসে জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি বিষ্টুদা ?

এতদিন বিলাতে থেকে একথা আবার জিজ্ঞাসা করিস !

যাকগে, সিগ্রেট জুতোর তলায় চেপে নিভিয়ে ফেলে বললো রতন, দেশের কী খবর, বউ কেমন আছে তোমার ?

কি জানি, খুড়ার একটা চিঠি আসলো কাল সকালে—

ভালো আছে তো তারা ?

খারাপ থাকবার তো কোন কারণ নাই। তবে চিঠিটা খুলি নাই এখনও, আছে কোটের বুক-পকেটে।

অবাক হয়ে রতন বললো, বাড়ির চিঠি এখনও খোলো নি, দেশের খবর জানতে ইচ্ছে হয় না তোমার ?

একটুও উৎসাহিত না হয়ে বিষ্টু বললো, খবর আবার কী, খবর তো সেই এক, খুড়া টাকাপয়সা চায় হয়তো আবার—

তাহলেও দেশের চিঠি, একটু পড়ো না শুনি ?

হেসে বিষ্টু বললো, দেশের থেকে চিঠি-পত্র পাস না বুঝি তুই ?

না, গম্ভীর হয়ে গেলো রতনের মুখ, দেশের কে আর আমাকে চিঠি লিখবে ?

তবে পড় তুই আমার চিঠি, দেখ কোটের পকেটে আছে।

তোমার চিঠি আমি পড়বো কি?

দেশের খবর জানতে সাধ তোর, আর খুড়ার চিঠি পড়বি তাতে হয়েছে কি? নে, জোরে জোরে পড়, আমিও শুনি—

রতন উঠে বিষ্টুর কোটের পকেট থেকে সেই এয়ার-লেটার নিয়ে খুব সাবধানে ছিঁড়ে জোরে পড়তে লাগলো—

বিষ্টু বাবাজীবন,

আশা করি তোমার সর্বপ্রকার কুশল। বহুবার তোমাকে পত্র লিখিয়া কোন উত্তর পাই নাই। যাহা হউক আর লিখিবো না। তোমাকে শুধু একটি দুঃসংবাদ দিবার জন্য এই শেষবার লিখিতেছি।

তুমি বিলাতে মেমসাহেব বিবাহ করিয়া আবার সংসার পাতিয়াছ শুনিয়া আমাদের মা লক্ষ্মী তোমার পত্নী সতী-সাধ্বী শ্রীমতী দুর্গারাণী তিন চারদিন হইল শরীরে কেরাসিন তেল ঢালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে—

কী কী কী বললি, — খাট থেকে লাফিয়ে উঠে রতনের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিলো বিষ্টু। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, আমার এ সর্বনাশ কে করলে গো— কে মিথ্যা খবর রটালে —কবে আবার আমি মেম বিয়ে করলাম, বল তুই রতনা—

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো রতন। সে এক দৃষ্টিতে বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটি কথাও বলতে পারলো না। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

বিষ্টুর কান্না ছাড়া তখন আর কোনো শব্দ নেই। আর কারুরই ভাঙলো না ঘুম। সে গভীর রাত্তিরে সমস্ত ইস্ট এণ্ড একেবারে নিস্তব্ধ।

সারা রাত কেঁদে সকাল বেলা বিষ্টু ঘুমিয়ে পড়লো। তার কান্নার আওয়াজে রতন একেবারেই ঘুমোতে পারে নি। বিষ্টুর পাশে শুয়ে সকাল বেলাও আর ঘুম এলো না।

আজ রবিবার। কারুর কাজের তাড়া নেই। এক সময় আস্তে আস্তে উঠলেই চলবে। হাই তুলে পাশ ফিরে রতন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। বাইরে বরফ পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বড় বেশী ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে আজ সকালবেলা। জানলার কাচ আর পুরু পর্দা ভেদ করে ঘরে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া আর আরও বেশী ঠাণ্ডা হচ্ছে সেই ঘর। রতনের ইচ্ছে হলো গ্যাসটা জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু ওঠবার কথা ভাবতেই তার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে গেলো।

রতন ভাবছিলো বিষ্টুর বউ-এর কথা। বিলেতে এতোদিন থেকে একথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অবাক হয়ে সে ভাবছিলো শুধু গুজবে বিশ্বাস করে মানুষ আত্মহত্যা করে কেমন করে। জীবন কি এতোই সুলভ! মরে কি শান্তি পেলো বিষ্টুর স্ত্রী? নিজেকে জ্বালিয়ে এমন করে স্বামীকে কাঁদালো কেন। পুড়ে মরে কাকে কী শিক্ষা দিলো সে আর নিজেকেই বা দিলো কী? খাটে শুয়ে ছটফট করতে লাগলো রতন।

কিন্তু আর শুয়ে থাকা চলে না। এগারোটা বেজে গেছে। ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে বিষ্টুর বউ-এর মরার খবরটা দেয়া দরকার। ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে রতন দরজা খুললো ঘরের। প্রথমে গেলো সে দীনবন্ধুর ঘরে।

পায়ের শব্দ শুনে চোখ না খুলে বললো দীনবন্ধু, কে গণেশ, চা এনেছিস বাবা? তারপর চোখ খুলে রতনকে দেখতে পেয়ে বললো,

ও তুই! এই ভোরবেলা উঠে পড়েছিস যে বাপ, বলি রোববার কি রোজ রোজ আসে রে?

ভোর আবার কোথায়, বারোটা বাজে —

আমারও বারোটা বেজেছে কিনা, তাই তোর ঘড়িতে বারোটাই বাজুক আর তেরোটাই বাজুক — রোববার সকালে বিছানা ছেড়ে নড়ছি না বাবা! — দীনবন্ধু ভালো করে কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিলো।

বিষ্টু এসেছে —

জানি! ওকে বল একদিন মদ-টদ খাওয়াবে। আমাদের ঘাড় ভেঙে বেটা বারবার খেয়ে যায় —

ওর বউ মারা গেছে —

আপদ গেছে। এইবার মনের সুখে একটা মেমসাহেবের গলায় ঝুলে পড়তে বল —

কেরাসিন ঢেলে পুড়ে মরেছে ওর বউ।

ও বাব্বাঃ, বুকের পাটা ছিলো বল?

আঃ, রেগে বললো রতন, আত্মহত্যা করে মারা গেলো বেচারী আর অমন করে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

থাম থাম, বেটা লেকচার দিচ্ছে আমাকে। বলি কী করতে হবে শুনি? কোথায় কে মরেছে তার জন্যে সাত হাজার মাইল দূরে বসে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভেসে বম্বে গিয়ে পৌঁছতে হবে নাকি রে? নিজের বউ মরলেই বা আমার কী? তা বল শুনি মরলো কেন?

কে গুজব রটিয়েছিলো বিষ্টু আবার নাকি এখানে একটা মেম বিয়ে করেছে —

হো হো করে হেসে বললো দীনবন্ধু, তাই শুনে কাল হলো বউ-এর? তা গুজব শুনে যার মরার বাসনা জাগে তার মরাই উচিত। হিংসুটে মন ছিলো বল্? সতীন হয়েছে শুনেই মলো পুড়ে। যা যা আপদ গেছে, ভালোই হয়েছে। দীনবন্ধুর কথা শুনে চোখ লাল করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রতন। ..

দীনবন্ধু ইণ্ডিয়া হাউসের মেসেঞ্জার। তার বয়স কতো বোঝা কঠিন। পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়তো। লোকটাকে আজকাল আর রতনের ভালো লাগে না। দেশে তার রুগ্ন স্ত্রী আর মেয়ে, অথচ তাদের নামও করে না কখনও। বলে, দেশে গিয়ে কী হবে, কবে ছেড়ে এসেছি তাদের, গতি একটা হয়েছে নিশ্চয়ই এতো দিনে— বাঙালী বউ নিয়ে ঘর করা আমার আর পোষাবে না বাবা —

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তা এখানে থেকেই বা করবে কী?

দীনবন্ধু উত্তর দেয়, ব্যবসা করবো রে, ইণ্ডিয়া হাউসে আর বেশিদিন থাকছি না বাবু। তবে কি জানিস, ওখানে অনেক বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ হয় বলেই পড়ে আছি। শিগগিরই কাজ ছেড়ে আমি ব্যবসা ধরবো, তোরা দেখ না চুপ করে—

কিন্তু শুধু বড়ো বড়ো কথাই সার। ব্যবসা ধরবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না দীনবন্ধুর। কথায় কথায় রতনের কাছ থেকে টাকা ধার চায় আর সে টাকা ফেরত চাইলেই রেগে যায়। বলে, মেরে দেবো নাকি টাকা আমি তোর? এতো করলাম তোর জন্যে, মানুষ করে দিলাম আর আমাকেই দিচ্ছিস তাগাদা, ব্লাডি সোয়াইন।—

কিছু বলতে পারে না রতন। শুধু তার মনে হয়, হৃদয় বলে কিছু নেই দীনবন্ধুর। হয়তো ওদিকে মেয়েকে কোলে নিয়ে ত্নমুঠো

ভাতের জন্যে স্ত্রী দোরে দোরে ঘুরছে। কিন্তু পরের ভাবনায় দরকার কী তার, তাই নিজের ভাবনা ভাবে রতন।

পাশেই রান্নাঘর। সেখান থেকে গোলমাল ভেসে আসছে। কিন্তু রান্নাঘর বলে যে কোনো কথা আছে সেকথা বোধ হয় ভুলেই গেছে এরা আজকাল। সবাই বলে, কিচেন। বেশ বড়ো কিচেন। গ্যাসের উনুন, তার পাশেই বাসন ধোবার সিঙ্ক্। অনেক চেয়ার আর পুরোনো টেবিল। র‍্যাকে রঙ-বেরঙের সস্তা কাচের বাসন—চায়ের কাপ ডিশ। টেবিলের ড্রয়ারে কাঁটা চামচ ছুরি, উপরে রুটি মাখন জ্যাম মার্মলেড আর এপাশে ওপাশে ছড়ানো আলু কপি আরও অনেক তরকারি। দু ধারে দুধের ছোটো বড়ো বোতল। যার যখন ইচ্ছে কিচেনে এসে মাখন মাখিয়ে রুটিতে কামড় দেয়, দুধের বোতল শেষ করে, কিংবা কাঁচা কপি কড়াইশুঁটি আর পেঁয়াজ মিশিয়ে নুন মাখিয়ে চিবোয়।

সকালে বড়ো একটা ওদের দেখা হয় না। যে যার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেয়ে সময়মতো বেরিয়ে যায়। চৌধুরী ছাড়া লাঞ্চ বাইরে খায় আর সকলে। নিজের লাঞ্চ নিজেই করে নেয় চৌধুরী। বাইরে সে বার হয় খুব কম। ব্রাহ্মণের ছেলে সে! নিজেও খাঁটি ব্রাহ্মণ। চল্লিশের ওপর বয়স। কিছুই করে না চৌধুরী। তাই সংসারের হিসেব রাখার ভার তার ওপর।

এদের কেউ যখন বলে, সংসারে এবার অন্তত দুটো পাউণ্ড দাও, বড়ো টানাটানি—

পয়সা? হেসে বলে চৌধুরী, পয়সা আমার কোথায়? গরিব বামুন আমি—

আর কেউ কিছু বলে না তাকে। মাঝে মাঝে শুধু দীনবন্ধু

চেঁচিয়ে ওঠে, নাঃ, বিলেতে এসেও নিস্তার নেই, এক বেটা বিটলে বামুনের পিণ্ডি চটকাতে হবে। হাঁকা হাঁকা বিটলেটাকে—পয়সা-কড়ি দেবার নাম নেই শুধু গোগ্রাসে খাওয়া। বেটাকে না হাঁকালে তোদের কপালে শুকনো কলা ঝুলিয়ে দেবে, বলে দিলাম আমি। যতো মড়া মরে এই রাজবাড়িতে এসে! ইণ্ডিয়া হাউসে একটা মেসেঞ্জারের চাকরি খালি ছিলো, বললাম নিয়ে নিতে, তো বলে কিনা বামুন হয়ে চাকরের কাজ করবো কেমন করে। বিনা পয়সায় খেয়ে পরে থাকতে পেয়ে কুঁড়ের বাদশা হয়েছে, হাঁকা হাঁকা বিটলেটাকে—

কিন্তু দীনবন্ধুর কথায় কান দেয় না কেউ। চৌধুরীকে ভালো লাগে সকলের। হাজার হোক ব্রাহ্মণ তো! তাই তার আলাদা খাতির এ বাড়িতে। কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না চৌধুরী। নিজেকে নিয়ে নিজেই বিভোর। আমিষ খায় না সে, গভীর শীতেও শুধু নিরামিষ খেয়ে হাসিমুখে চালিয়ে দেয়।

তারই ঘরে থাকে গণেশ। আর্চওয়েতে তার ফলের দোকান। গণেশ পুরো সাহেব। বেঁটে কুচকুচে কালো আর ব্যাকব্রাশ-করা চুল তার। রোজ অনেক রাত্তির অবধি গণেশ জুতো পালিশ করে, রুমাল কাঁচে, কলার আর শার্ট ইস্তিরি করে। সকালবেলা সাহেবদের মতো ফিটফাট হয়ে রাস্তায় বার হয়।

বাংলা একেবারেই বলে না গণেশ। দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার। সে মনে করে তার জন্মভূমি এই লণ্ডন। বরাবর সে এখানেই থাকবে, তারপর একদিন মেম বিয়ে করে ভালো করে সংসার পাতবে।

দীনবন্ধুর ঘর থেকে বেরিয়ে রতন বুঝতে পারলো সকলে জড়ো

হয়েছে কিচেনে। ওখানে একেবারে মুখ ধুয়ে যাওয়া যাবে ভেবে সে বাথরুমে ঢুকলো। কিন্তু এতো চিৎকার হচ্ছে কিচেনে যে বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে প্রত্যেকটি কথা শুনতে পেলো রতন। হৈ-হুলোড় চলেছে কিচেনে। করবেই বা না কেন বেচারারা! এই একদিনই দেখা হয় সকলের। অন্যান্য দিন রাত্তিরে ডিনার খাবার সময় কথা বলবার উৎসাহ থাকে না কারুর—এতো ক্লান্ত হয়ে পড়ে প্রত্যেকে। কোনো রকমে খাওয়া সেরে যে যার ঘরে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। তাই সারা সপ্তাহের সমস্ত ক্লান্তি রবিবারে তারা উজাড় করে ঢেলে দেয় হৈ-হুলোড় আর চিৎকারে।

গান গাইছে বেচ্চো, কে বিদেশী কোন উদাসী মাইরি বাঁশেরো বাঁশি বাজালে গো—

হ্যাঁ রে বিদেশী, হেঁকে উঠলো মুন্দ, তোর বাঁশি শুনে মেম সাব মূর্ছা যাবে রে। বলেই সে গেয়ে উঠলো, লণ্ডনসে দুলহান্ লায়া রে হায় বাবুজী—হায় হায় লণ্ডনসে দুলহান্—লণ্ডনসে দুলহান্—ফাটা রেকর্ডের মতো একই লাইন সে গেয়ে যেতে লাগলো।

স্টপ্, হালার পো হালারা, কোয়ায়েট, গণেশ ধরলো তার ইংরেজী গান, আই উইল টেক্ দি হাই রোড, ইউ উইল টেক্ দি লো রোড—বাব্ বাব্ বাব্ বাব্ বাব্বিঃ—কোন ছবি থেকে গানের এ দুটি লাইন বুঝতে পেরে সে মনে রেখেছে কে জানে।

মাছের কালিয়া রান্না করছে চৌধুরী। তারই গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বাড়িতে।—রান্নার আর কতো দেরি বামুন সাহেব?

এই হয়ে এলো—

ক্ষুধায় প্রাণ যে যায়, এলিয়ে পড়বার ভান করলো শিবে।

কেউ আলু কুটছে, কেউ পেঁয়াজ কাটছে, কেউ কড়াইশুঁটির

খোসা ছাড়াচ্ছে, কেউ বাসন ধুচ্ছে, আর থেকে থেকে যার যা ইচ্ছে তাই বলে চিৎকার করে উঠছে।

কিচেনে অন্যান্য ঘরের চেয়ে ঠাণ্ডা একটু কম। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরও ওরা অনেকক্ষণ এখানে বসে গল্প করে। রতন সেখানে এলো যথাসময়ে।

এই যে এই যে—

হেলো হেলো—

পাইপে টান মেরে গণেশ বললো, গুডমর্নিং ইনকিপার।

নারকোল গাছে কে ? বলি, আমার নারকোল গাছে কে রে ? হেবো রতনকে জড়িয়ে ধরে নাচতে আরম্ভ করে দিলো।

নারকোল গাছে তোমার বাবা, উত্তর দিলো মুন্দ।

নারকোল গাছের সেই গল্প বড়দিনের ছুটিতে এদের সকলকে বলেছিলো রতন। নোয়াখালিতে, রতন তখন খুব ছোটো, এক পাগল সারা গায়ে রাংতা পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতো—হাতে তার এক লাঠি। পাগল নিজেকে মনে করতো লাটসাহেব। নোয়াখালির সমস্ত কিছুই তার। ইচ্ছা করলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। ওদিকে, কিছু দূরে জিতেন পণ্ডিতের বাড়ি। তার বাগানে অনেক ডাবের গাছ। কিন্তু পণ্ডিতকে ছেলেরা বাঘের মতো ভয় করে। অথচ কচি ডাব খাবার ইচ্ছেও তারা কিছুতে দমন করতে পারে না। তাই হতভাগা ছেলেগুলো একদিন শরণ নিলো পাগলা লাট সাহেবের।

তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, নিবেদন আছে লাটসাহেব।

লাঠি ঠুকে হেসে লাটসাহেব বললো, বল বল নির্ভয়ে বল বাছারা, তোমরা আমার নাবালক প্রজা, ভয় কী ?

সব নোয়াখালি আপনার তো হুজুর ?

নোয়াখালি ? হাঃ হাঃ হাঃ, তোমরা নাবালক তাই জানো না, আমি লাটসাহেব, সব ভারতবর্ষটাই আমার—

আচ্ছা লাটসাহেব, পণ্ডিত মশাই-এর বাগানটাও আপনার তো ?

আরে হ্যাঁ গো নাবালক প্রজা, জিতেনকে আমি দয়া করে থাকতে দিয়েছি ওখানে—

আপনি ইচ্ছে করলে ডাব খেতে পারেন ?

ডাব ? শুধু ডাব ? ইচ্ছে করলে আমি কী না করতে পারি ? ইচ্ছে করলে গাছকে গাছ উপড়ে ফেলে জিতেনের মাথায় বাড়ি মেরে বের করে দিতে পারি। এই দেখ না, কতো ডাব চাই তোমাদের ? কিন্তু দা, একটা দা—

ছেলেরা দা হাতে নিয়েই এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এই যে লাটসাহেব হুজুর ! দা হাতে নিয়ে তরতর করে গাছে উঠে গেলো লাটসাহেব। আর ঘচাঘচ ডাব ফেলতে লাগলো।

মোটা গলায় জিতেন পণ্ডিত ঘরের ভেতর থেকে হাঁকলো, নারকোল গাছে কে ? কোনো উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলো না লাটসাহেব।

একটু পরে হাঁকলো জিতেন, বলি আমার নারকোল গাছে কে রে ?

এইবার লাটসাহেব পণ্ডিতের মোটা গলা নকল করে উত্তর দিলো, নারকোল গাছে তোমার বাবা। লাটসাহেব আমি—আমার কাছে কৈফিয়ত চাস এতো সাহস তোর—

ছেলেরা ততক্ষণে ডাব নিয়ে উধাও হয়েছে।

এ গল্প বড়ো ভালো লেগেছে সকলের। আর তারপর থেকে রতনের নাম দিয়েছে হেবো, নারকোল গাছে কে। হেবো কিন্তু তখনো রতনকে জড়িয়ে ধরে নাচছে আর একসুরে বলে চলেছে, নারকোল গাছে কে, নারকোল গাছে কে, বলি আমার নারকোল গাছে কে রে?

আঃ থাম থাম, বিরক্ত হয়ে রতন বললো, খারাপ খবর আছে একটা —

গণেশ বললো, ইওর ফ্রেণ্ড মিঃ বিষ্টু হিয়ার, মেট হিম?

হ্যাঁ, বেচারার বউ আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে।

রতনের কথায় ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। আগাগোড়া কাহিনী আবার বললো রতন।

তারা তারা, নিশ্বাস ফেলে বললো চৌধুরী, বিদেশে বেচারা কতো দুঃখ পাবে বলো তো!

কেন যে দূর দেশে আসে মানুষ, বেচ্চো গালে হাত দিয়ে যেন ভাবতে থাকে।

গণেশ জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট হি ডুয়িং পুওর বয়?

ঘুমোচ্ছে।

হোয়াট? পকেট থেকে রুমাল বের করে বললো গণেশ, ওয়াইফ গন্ আচ্ বেণ্ড চিপিং—ফানি!

সকলে চুপ করে রইলো। মৃত্যু অকস্মাৎ ছায়া ফেললো সেই আনন্দ-মুখর ঘরে। প্রত্যেকেই ভাবছিলো তাদের দেশের কথা—তাদের প্রিয়জনের কথা। যদি এমন করে হঠাৎ একদিন তাদেরও আত্মীয়স্বজন হারিয়ে যায় মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে! হায় রে, এই

মুহূর্তে যদি সাত হাজার মাইল দূরে পাখি হয়ে উড়ে যাওয়া যেতো তাহলে হয়তো ওরা সকলেই উড়ে যেতো সোনার বাংলায়।

ওরে আমার কী হলো রে —চিৎকার করে কেঁদে উঠলো বিষ্টু।

সকলে ছুটে গেলো তার ঘরে।

নিয়ে চল, এখনি তোরা আমাকে দেশে নিয়ে চল—একদিনও নয়, আর একদিনও আমি থাকবো না এখানে, ছটফট করে কাঁদতে লাগলো বিষ্টু, ওরে রতনা, কই, নিয়ে গেলি আমাকে ?—

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুজে পেলো না কেউ। শুধু গজ গজ করতে করতে দীনবন্ধু কিচেনে গিয়ে লাঞ্চ খেতে লাগলো। এরা সকলেই শুনতে পেলো তার গলার স্বর। আপন মনে বকবক করছে দীনবন্ধু, রবিবার সকালে একটু ঘুমোবো ভাবলাম, তা শুরু হলো বুড়ো ধাড়ির ডুকরে কান্না। ভাগাড় হয়েছে এই অল্ডগেট। ওরে তোরা হরিবোল দে, ওর কানে মধুর হরিবোল দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর —

রাগে রতনের সমস্ত শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছিলো। লোকটা কি পাথর ?

গ্যাসটা যখন প্রায় নিবু-নিবু তখন স্লটের মধ্যে একটা শিলিং ফেলে বেচ্চো হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিলো। একটা শব্দ হলো—ঠক। আবার দপ করে জ্বলে উঠলো গ্যাসের আগুন।

বিকেল হতে না হতেই অন্ধকার হয়ে গেছে। থমথম করছে আকাশ। শুধু ঝরে পড়ে যেন হাজার তুলোর কণা—রেশমের মতো মৃদু আর ফুলের চেয়েও নরম। ল্যাম্প পোস্টের আলো মিলিয়ে গেলো। পাতলা ঠাণ্ডা হালকা তুষারের ভাব ধূমের মতো

ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারপাশে। জানালার কাচের গা বেয়ে ঝরছে জল—নিস্তব্ধ নিঝুম পৃথিবী।

আড়মোড়া ভেঙে গণেশ বললো, চিম্‌পিলি ওয়েচটিং টাইম হালায়, লেট আচ্ গো আউট হালার পো হালারা—

এই শীতে কোন বেটা বাইরে যায়।

আহা, বাইরে মানে কি বাইরে, গম্ভীর গলায় বললো দীনবন্ধু, ঘর থেকে বেরিয়ে আর-একটা ভালো ঘরে গিয়ে ঢুকবো।

কোথায়? এতক্ষণ পর কথা বললো বিষ্টু। তাকে কথা বলতে দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠলো সকলে। কাল রাত্তির থেকে শান্ত হয়ে একটি কথাও বলে নি সে। দীনবন্ধু বললো আবার, 'পাবে' গো 'পাবে'। পেটে তু-এক ফোঁটা পড়লে সব তুঃখ ভুলে যাবে বিষ্টু বাবু।

হ্যাট ইজ ফাইন, গণেশ পাইপের ধোঁয়া ছাড়লো।

বিষ্টুর ঘাড়ে হাত রেখে বললো রতন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলো বিষ্টুদা, এখানে এমন করে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে তোমার।

যাবো? করুণ চোখে বিষ্টু তাকালো প্রত্যেকের দিকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে বৈকি, তুঃখ ভুলতে হবে তো, নাও উঠে পড়ো সবাই, বলে দীনবন্ধু উঠে দাঁড়ালো সকলের আগে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্কার্ফ চড়িয়ে ওভারকোট চড়িয়ে, গ্লাবস হাতে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো সকলে। গণেশ মাথায় পড়লো একটা ফেল্টহ্যাট। বাড়িতে রইলো শুধু চৌধুরী একা। মদ ছোঁয় না সে—এক ফোঁটা বিয়ারও নয়। সবাই বেরিয়ে গেলে আপন

মনে সে বলে উঠলো, বিষ্টুর বউ-এর আত্মাকে শান্তি দাও মা— বিষ্টুকে দুঃখ ভুলিয়ে দাও—তারা—তারা।

লোকে সংক্ষেপ করে নিয়ে বলে, পাব্—মানে পাবলিক হাউস।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে এমনি অসংখ্য পাব্। সাধারণত দুটো ভাগ—পাবলিক বার আর সেলুন লাউঞ্জ। পাবলিক বারে মদের দাম দু-এক পেনি কম, তাই সেখানে মজুর শ্রেণীর ভিড় বেশি। লোকে একটা বিয়ার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে, কাগজ বই পড়ে, চিঠি লেখে, বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে। শীতের লণ্ডনে মন দেওয়া-নেওয়ার পথ সুগম করে দেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা হলো এই পাব্গুলি। মদ খাওয়া এদেশে রীতি-বিরুদ্ধ নয় বলে মা ছেলের হাত ধরে কি বাপ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পাবে এসে আসর জমায়। ছোটো ছেলেমেয়েদের ভেতরে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই, তাই অনেক সময় দেখা যায় প্যারাম্বুলেটারে ছোটো ছেলে কিংবা মেয়েকে বাইরে রেখে মা ভিতরে গিয়ে ঢকঢক করে মদ খায়, তারপর ফিরে এসে আবার গাড়ি ঠেলে বেড়ায়। পাব খোলা থাকে বেলা বারোটা থেকে তিনটে অবধি আর সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত্তির এগারোটা অবধি। সাড়ে দশটায় কয়েকটা আলো ঠুকঠুক করে নিভিয়ে বারমেইড চেঁচিয়ে ওঠে, লাস্ট অর্ডার—লাস্ট অর্ডার প্লিজ—

দীনবন্ধু সদলবলে যে মদের দোকানের পাবলিক বারে এসে ঢুকলো তার নাম অল্ডগেট আর্মস্। এর মধ্যেই ভিড় জমেছে সেখানে। বিয়ার, গিনেস আর নানা সস্তা মদের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। একদল ভারতীয়কে ঢুকতে দেখে সবাই ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

রোজ দেখছে বেটারা, তবু কেন অমন করে তাকিয়ে থাকে বুঝি না, গিলে খাবে যেন। দীনবন্ধু চেয়ারের আশায় এদিকে ওদিকে তাকালো। কিন্তু সকলের বসবার জায়গা হলো না, কয়েকজন পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কে কী খাবে বল?

যা হয়, তোমার ওপরেই আমরা ছেড়ে দিলাম দীনদা—

হুইস্কি আর এক পাইণ্ট বিয়ার নেয়া যাক প্রথমে?

বেশ।

দে দে, যে যার পয়সা দে।

সকলেই দিলো পয়সা, শুধু বিষ্টুকে কিছু দিতে দিলো না রতন। সে দিলো তার মদের দাম। পয়সা নিয়ে দীনবন্ধু ব্যস্ত হয়ে নিজের কোটের প্রত্যেক পকেট বার বার হাতড়ে বললো, ওই যাঃ, আচ্ছা মুশকিলে পড়লাম দেখি, পয়সা যে আমার পড়ে আছে অন্য কোটের পকেটে—

যাও না, হেসে বললো হেবো, বাড়ি গিয়ে কোটটা বদলে এসো না, এই কাছেই তো—

হ্যাঁ আমি আবার এখন বরফ মাথায় করে একা একা বাড়ি যাই —দে তো রতনা কিছু ধার, দিয়ে দেবো তোকে—

রতন নিঃশব্দে বের করে দিলো পয়সা।

আড়চোখে বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে দীনবন্ধু বললো, বল না রতনা—

আঃ—রতন ইসারায় চুপ করতে বললো তাকে।

দীনবন্ধু ভিড় ঠেলে কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেসে বারমেইড বললো, ইয়েস স্যার?

কথাটা শুনতে পেয়ে মুন্দ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ, খাতির কতো !

দীনবন্ধু প্রত্যেককে এনে দিলো মদ। থ্যাঙ্ক ইউ, গ্লাশ হাতে নিয়ে বললো গণেশ, তারপর 'চিয়ারস্' বলে মদে চুমুক দিলো।

ইংরেজরা তখনও তাকিয়ে ছিলো ওদের দিকে। কী মজা পেয়েছে ওরা কে জানে। নিজেদের মধ্যে কী কথা বলে মাঝে মাঝে খুব জোরে হেসে উঠছে ওরা। আর, কিছু না বুঝে ওদের হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেসে উঠে মুন্দ শুধু বলছে, হাসির কথা !

কেউ কিছু বললো না, শুধু বেচ্চোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে একমুখ ধেঁায়া ছেড়ে বললো গণেশ, হেলো হালা মুন্দ, কোয়ায়েট পিলিজ্, বি জেণ্টেলমেন্—

থাম তুই গনশা, বেটা বড় চাএব আমার রে—

দামী মদ খাওয়া অভ্যেস নেই বিষ্টুর। কয়েক ফোঁটা হুইস্কি পেটে পড়তেই তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো আর স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলে গায়ে পেলো হাতির জোর। পাশেই তার বসেছে রতন, কিন্তু বিষ্টু রতনের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর ভাবছে ও দাঁড়িয়ে আছে। তাই তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কেবলই বলছে, এই রতনা শিগগির বসে পড়, জায়গা পাবি না, এই রতনা—। ওরা তুজনেই যে বসে আছে সে কথা কিছুতেই বিষ্টু ভাবতে পারছে না। এই সময় দীনবন্ধু আবার নতুন করে করলো পরিবেশন।

রতন, গণেশ আর দীনবন্ধু ছাড়া অন্য সকলের বেশ ঘোর লাগলো। বিষ্টু তো প্রায় টলে পড়ে আর কি। সামনে ইংরেজেরা ঠিক তেমনি করেই হাসাহাসি হট্টোগোল করে যাচ্ছে। কেউ কেউ দেয়ালে

টাঙানো বোর্ডে কাঠি ছুঁড়ে খেলছে, কেউ মেতে উঠেছে অন্য ঘরোয়া খেলা নিয়ে। গনগন করে জ্বলছে কয়লার আগুন আর ম্যান্টেল-পিসের ঠিক ওপরেই লেখা রয়েছে, বেটিং নট অ্যালাউড। ফাঁকে ফাঁকে বারমেইড এসে খালি গেলাসগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে বলছে কেউ কেউ, বড়ো ঠাণ্ডা না ?

উঃ, ভয়ানক, বারমেইড কেঁপে ওঠার ভান করে।

শিবে বললো, মিঠা নেশা ধরছে আমার—ওকি, দেখো দীনদা, ইংরেজের বাচ্চা আমাগো পানে চাইয়া কী বলে—

নাথিং নাথিং, নট মিন ইউ, গণেশ ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলো শিবেকে।

ওই শোনো ব্লাডি ব্লুডি কয়—

দীনবন্ধু দেখলো, সর্বনাশ, এখুনি এদের নিয়ে সরে পড়তে না পারলে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাবে এরা। তাই তাড়াতাড়ি বললো, কিছু বলছে না আমাদের। নে এবার চল দেখি সব—

হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিষ্টু। তারপর চিৎকার করে উঠলো, হু সে ব্লাডি ? একটা ছোকরা ইংরেজ কাউন্টারে ঘুসি মেরে বললো, শাট আপ। টেল ইওর ড্যাডি শাট আপ, মুন্দ ধাঁ করে তার নাকে মারলো ঘুসি।

যা হবার তা তো হয়ে গেল। এক কোনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো রতন। আর গণেশ শুধু বলছে, গড সেভ, ও গড সেভ—। সাহেব-সুবোর সঙ্গে মারামারি করা—সেকথা ভাবলে লজ্জা করে তার।

ওরে থাম থাম, এরকম কেউ করে না এখানে—কিন্তু কে শোনে

কার কথা! দীনবন্ধুর স্বর গুঁড়ো হয়ে গেলো সকলের চিৎকারে আর গেলাস-বোতল ভাঙার ঝনঝন শব্দে।

ইউ ডার্টি ইণ্ডিয়ান—

তাকে মাটিতে ফেলে দাঁত খিঁচিয়ে বললো বিষ্টু, তেরা বাপকো বোলা আভি—

একটা আধ-বুড়ো ইংরেজ বিষ্টুর কাছে এসে বললো, বিহেভ ইওর সেল্‌ফ—

চোপ্‌ রও গান্ধীকা বাচ্চা—তেরা মাকো বিহেভ শিখলা—

বারমেইড প্রথম কয়েক মিনিট কী করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর কয়েকটা আলো পরপর নিবিয়ে দিয়ে তুলে নিলো টেলিফোনের রিসিভার। সেটা নামিয়ে রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো ছ-ফুট-লম্বা দুজন সুদর্শন লণ্ডন-পুলিশ। আর মন্ত্রের মতো কাজ হলো। এক মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ হলো সে পাব্‌। নেশা ছুটে গেছে সকলের। করুণ চোখে ওরা তাকিয়ে রইলো পুলিশের দিকে।

গুড ইভনিং, একজন পুলিশ বারমেইডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

বারমেইড বললো, ইণ্ডিয়ানগুলো আগে আমার ইংরেজ খদ্দেরদের গালাগাল করে, তারপর মারামারি ঘুসোঘুসি। এই দেখো না, আমার গেলাস বোতল বাল্‌ব্‌ ভেঙে কতো ক্ষতি করেছে—

পুলিশ আর-একজনকে ইসারা করলো। দরজা খুললো সহকারী। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আর অনেক তুষার-কণা উড়ে এলো ঘরে। দেখা গেলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ভ্যান। ওয়েল্‌,জেণ্টেলমেন্‌ প্লিজ্‌—হাত দিয়ে বিনীতভাবে বাইরের গাড়ি

দেখালো পুলিশ। অর্থাৎ এবার সেটাতে চড়ে তাকে ধন্য করতে হবে। অনেক ইংরেজ একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, উই ?

অল্ অফ্ ইউ প্লিজ, আরও বিনীতভাবে মৃদু হাসলো অফিসার। কাউকে চোখ রাঙালো না, কাউকে কঠিন কথা বললো না একটিও।

ভ্যানে বসে নিশ্চিন্ত হলো দীনবন্ধু। এখন আর মন খারাপ করে লাভ নেই। চোখ বুজে দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। কিন্তু কাঁদছিলো রতন।

সি, পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে বললো গণেশ, ওল্ড্ রতন ক্রাই লাইক্ লিটিল্ চাইল্ড্, তারপর দেশলাই খুঁজে না পেয়ে পুলিশের গায়ে আস্তে টোকা মেরে বললো, হেলো ওপিচার, গট ফায়ার ?

তার হাতে সিগ্রেট দেখে ব্যাপার বুঝে নিলো পুলিশ! মৃদু হেসে বললো, আই অ্যাম আফ্রেড ইউ কাণ্ট স্মোক ইন দি ভ্যান—

থাম তুই রতনা, বাচ্চা ছেলে নাকি রে তুই ? সান্ত্বনা দিলো দীনবন্ধু, কতো লোক এসে কতো দেখে লণ্ডন শহরে, বলি জেল দেখার ভাগ্যি কটা লোকের হয় রে ? থাম থাম—

তুষার-ঝরা সন্ধ্যায় সেই পুলিশ-ভ্যান থানার দিকে ছুটে চললো।

৩

যখন ফিসফিস রিমরিম তুষার ঝরে, আর দেখতে দেখতে শাদা হয়ে যায় চারপাশ, তখন কে যেন নিঃশব্দে রতনের মনের নিবিড়ে এসে দাঁড়ায়। সে তার সোনা বউ। ছুটির দিন হলে কিছুতেই ঘরে থাকতে পারে না রতন, রেইন কোট গায়ে দিয়ে ছোটো ছেলের মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। আর রেস্তোরাঁয় থাকলে সব কিছু ভুলে বার বার দিশে হারায়।

রাস্তায় বেশি লোক নেই। ছোটো ছেলেমেয়েরা বরফের বল ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলা করে। নোয়াখালির মানুষ রতন। তুষার-কণায় সে যেন শেফালির গন্ধ পায়। আর মনে হয়, কবে তোমার দেখা আমি পাবো সোনা বউ! কালো রঙ তার, লম্বা চুল, আঁটসাট দেহের বাঁধন আর টানা-টানা চোখ।

একদিন দেশে ফিরে যাবেই রতন। যেমন করে খালাসী হয়ে হঠাৎ চলে এসেছিলো ঠিক তেমনি করেই আবার চলে যাবে। শুধু টাকা করতে, ভালোভাবে খেয়েপরে তার সোনা বউকে নিয়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে বলে ঘর ছেড়ে এতো দূর দেশে এসেছে রতন। ফিরে গিয়ে সোনা বউকে খুঁজে বের করে বাঁধবে সে ঘর।

তুষারের দিনে এমনি অনেক কথা ভাবে রতন। তার অশিক্ষিত মাথায় খেলে নানা কল্পনা। বিদেশের কতো আশ্চর্য গল্প সে জমিয়ে রাখতে চায় তার অদেখা সোনা বউ-এর জন্যে। নিঃশব্দে তুষার

ঝরে, সবকিছু চাপা পড়ে যায়। শুধু ভেসে ওঠে চোখের সামনে তার সোনা বউ।

রিস্টওয়াচ দেখে সে হিসেব করে দেশে এখন সময় কতো, মাস মনে করে ভাবার চেষ্টা করে কী ঋতু! আর, হেমন্তের মাঠভরা ধান, নীল আকাশ আর পাখিরা তাকে ডাকে, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

ফিরে যাবে বৈকি রতন—একদিন ফিরে যাবেই।

প্রথমে লণ্ডনে নেমে কান্না পেয়েছিলো তার। এ কোন পাতাল-পুরীতে এলো সে। কয়েক দিন পরই আবার ফিরে যেতে চেয়েছিলো রতন। ঘন কুয়াশায় কাছের আলোগুলিও আবার ঢাকা পড়েছে। দুহাত দূরের মানুষের মুখ দেখা যায় না। এমন হাতড়ে হাতড়ে চলবে সে কেমন করে!

পরদিন সকালে আরও খারাপ লাগলো রতনের। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সূর্যের দেখা নেই। বাড়িগুলির মাথায় চিমনির ধোঁয়া আকাশ কালো করেছে। এই লণ্ডন! এই বিলেত! এই হতচ্ছাড়া দেশে মানুষ থাকে কেমন করে! তার ওপর কথা বলবার একটিও লোক নেই তার। টাই বেঁধে কোট-প্যাণ্ট পরে রতনের চলতে কষ্ট হয়। হাঁটু অবধি ধুতি তুলে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু যা শীত! সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

তারপর একদিন অল্ডগেটের আস্তানা খুঁজে পেতে খুব বেশি দেরি হলো না রতনের। অনেকদিন পর প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরে সে যেন বেঁচে গেলো।

তার পিঠ চাপড়ে দীনবন্ধু বললো, থেকে যাও এখানে, দেখবে

আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, কতো রকমের জিনিস আছে এই লণ্ডন শহরে।

কিন্তু জাহাজের চাকরি?

আরে দূর, কে কার খোঁজ রাখে? গা ঢাকা দিলে কেউ ধারও ধারবে না তোমার। এসো একটু বিয়ার খাও দেখি—

মদ খাবো?

সোনার চাঁদ ছেলে আমার! একি তোমার নোয়াখালি বাপধন? অমন কথা এখানে বোলো না, লোকে শুনলে হাসবে।

বলতে গেলে দীনবন্ধু রতনের লণ্ডনের গুরু। আস্তে আস্তে রতনকে লণ্ডনের বসবাসের উপযুক্ত করে নিলো। আদবকায়দা শেখালো, অনেক উপদেশ দিলো আর সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনের দেখবার জিনিসগুলো দেখিয়ে দিলো।

চারপাশে তাকিয়ে নানারকম ব্যাপার দেখেশুনে প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গেলো রতনের। কাজেই চোখের সামনে থেকে কুয়াশা কেটে যেতে বেশি দেরি হলো না। একে একে সব কিছুই আয়ত্ত করে নিলো সে। ভালো করে টাই বাঁধতে শিখলো, রোজ দাড়ি কামানো অভ্যাস করলো, একা একা 'পাবে' গিয়ে মদের অর্ডার দিতে লাগলো, আর অচেনা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবারও সাহস পেলো।

খুব শিগগিরই রতনের মনে হলো, খাশা শহর এই লণ্ডন। এতো আনন্দ আর কোথায়? কেউ চোখ রাঙায় না, কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। যত ইচ্ছে ফুর্তি করো, কারুর কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। এখানে মরণেও সুখ। তাই থেকে গেলো রতন। তবু সঙ্কোচ কাটতে তার বেশ দেরি হয়েছিলো বৈকি! প্রথমে বেশ

ভয় হতো, অসুবিধা হতো। একটা রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের সামনে দিয়ে বৃথাই চার-পাঁচ বার হাঁটাহাটি করতো রতন। কথা বলতে কিছুতেই সাহস করতো না। ও যে মেমসাহেব। সে-মনোভাব অনেকদিন তাকে বেশ দমিয়ে রেখেছিলো।

একদিন তো রীতিমতো বোকা বনে গিয়েছিলো রতন। সেকথা ভাবলে আজও তার হাসি পায়, আর, দু পাউণ্ড জলে যাওয়ার কথা ভুলতে পারে না। সত্যি বিলেতে না এলে বুদ্ধিশুদ্ধি খোলে না মানুষের।

গ্রীনপার্ক টিউব স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে সে মেয়েটি রতনের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। সাহস করে হঠাৎ রতনও ফেললো হেসে। ইসারা কাজে লেগেছে বুঝে মেয়েটি রতনের কাছে এগিয়ে এসে বললো, হ্যালো ডার্লিং।

কয়েকবার ঢোঁক গিলে অদ্ভুত ইংরেজী উচ্চারণে রতন জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী ?

মেয়েটি কিন্তু রতনের উচ্চারণ বুঝতে পারলো। বোধ হয় এই ধরনের লোক আরও দেখেছে সে। হেসে উত্তর দিলো, টেরী।

আমি—আমি ইংরেজী জানি না—

কিছু যায় আসে না, টেরী খুব আস্তে রতনকে বললো, আমার সঙ্গে আসবে নাকি ?

কোথায় ?

আমার ঘরে—খুব কাছেই।

না না, ওই পার্কে চলো—

বেশ রেগে বললো টেরী, তোমার সঙ্গে পার্কে বসে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।

ঢোঁক গিলে রতন বললো, আমি টাকা দেবো তোমাকে।

তোমার কাছ থেকে দু পাউণ্ড নিয়ে পুলিশকে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিতে আমি রাজী নই—

টেরী চলে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি তার একটা হাত ধরে রতন বললো, আমি শুধু গল্প করবো তোমার সঙ্গে—

রতনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে টেরী বললো, দু পাউণ্ড দিতে হবে আমাকে, আর কুড়ি মিনিটের বেশি আমি বসতে পারবো না। রাজী?

হ্যাঁ।

কিছু যদি মনে না করো, দয়া করে টাকাটা এখুনি আমাকে দিয়ে দাও?

এই তো, টাকা বের করে দিলো রতন।

ধন্যবাদ, পাউণ্ডের দুখানি নোট ব্যাগে রেখে টেরী রতনের হাত ধরে গ্রীনপার্কের ভেতরে নিয়ে চললো। যেন রতনের সঙ্গে তার কতোদিনের পরিচয়! আর ধন্য হয়ে গেলো রতন। বিলেতে মেমসাহেবের হাত ধরে চলেছে সে। এমন সৌভাগ্য কটা লোকের হয়। আনন্দে তার শরীরে শিহরণ লাগলো। এ সময় একটিও দেশের লোক তাকে দেখলো না কেন!

গ্রীনপার্কে একটা বেঞ্চে বসে টেরী দুঃখ প্রকাশ করলো, কেন আমার ঘরে গেলে না? শুধু শুধু পার্কে বসে কেউ দু পাউণ্ড নষ্ট করে?

তোমার ঘরে যেতে আমার ভয় করলো।

কেউ দেখতো না আমাদের, ভয় কিসের?

জানি না।

তুমি পাগল, শুধু এর জন্য টু পাউণ্ড—টেরী রতনের খুব কাছে সরে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো।

রতন টেরীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি কাল আসবে ?

হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি গ্রীনপার্ক টিউব স্টেশনের সামনেই দাঁড়াই।

কাল আবার তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবো। ইংরেজী বলতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো রতনের।

বেশ তো, ভারতীয় বন্ধু পেতে আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার বাড়ি কোথায় টেরী ?

বাড়ি অনেক দূর, তবে কাছেই আমার ঘর, আমি বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধ্যেবেলা সেখানেই নিয়ে যাই !

কাল আমি তোমার ঘরে যাবো।

আজই যাওয়া উচিত ছিলো তোমার। শুধু এর জন্যে টু পাউণ্ড—

আর কী কথা বলবে ওরা ! চুপ করে কাটলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ রতনকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টেরী, কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে প্রিয়তম—

আর একটু বোসো টেরী !

বসতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু বোঝো তো, আমাকে নিজের খরচ চালাবার জন্যে অনেক রোজগার করতে হয়। কাল যদি আসো তাহলে আবার দেখা হবে। গুডনাইট ডার্লিং—

গ্রানপার্কের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো টেরী।

অনেকক্ষণ সেই বেঞ্চে বসে রইলো রতন। দূরে রাস্তার আলো

জ্বলছে। পার্কে অনেক লোকের ভিড়। অনেকেই মেয়ে-বন্ধু নিয়ে চলেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে রতন ভাবছিলো, কাল টেরীর সঙ্গে নিশ্চয়ই সে যাবে তার ঘরে।

দীনবন্ধু সমস্ত ব্যাপারটা রতনের মুখে শুনে খুব জোরে হেসে উঠলো, গাধা কোথাকার! এ রকম করে পয়সা নষ্ট করে কেউ? ওর ঘরে গেলি না কেন তুই?

ওরে বাবা, শেষে কি বিপদে পড়বো!

বিপদ আবার কি, কড়ি ফেলবি তেল মাখবি।

কাল আবার ও আসবে বলেছে।

কিন্তু এরকম করে পয়সা ওড়ালে না খেতে পেয়ে মরে যাবি যে। আর ওদিকে যাস কেন? ওয়েস্ট এণ্ডে যাওয়া কি তোর আমার পোষায়? বড়োলোকের পাড়া ওটা!

তবে কোথায় যাবো?

এদিকেই কতো আছে! আর খুব সস্তা, বুঝলি—

কোথায়, কোথায়? রতন সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলো।

এই অল্ডগেটেই। চাস তো ঠিকানা দেবো আমি। আগে ফোন করে তারপর যাস।

দীনবন্ধুর কথা রাখলো রতন। পরদিন বড়োলোকের পাড়ায় টেরীর সঙ্গে দেখা করতে আর গেলো না। কিন্তু কয়েকদিন পর একটু ইতস্তত করে দীনবন্ধুকে বললো, সেই যে—বলো না একটা ঠিকানা—

ধমকে দিলো দীনবন্ধু, বলি মিঁউ মিঁউ করিস কেন বিলেতে বসে? কী চাস খুলে বল।

মেয়ের ফোন নম্বর।

তাই বল। দুধের বাছা আমার রে, এই কথাটা বলতে লজ্জায় একেবারে মরে গেলি যে অ্যাঁ ?

আমি কথা বলতে পারি না ভালো, তুমি ফোন করে বন্দোবস্ত করে দাও—

এক কথায় দীনবন্ধু সব ঠিক করে দিলো। কাছেই বাড়ি সে মেয়ের। নাম বেটি। পাঁচ তলায় ফ্ল্যাট।

দীনবন্ধু বললো, লিফট আছে। তবে অতো হ্যাঙ্গামে তোর দরকার নেই। ঘাবড়ে যাবি। সিঁড়ি দিয়ে সটান ওপরে উঠে ঘণ্টা বাজাবি। রাত্তিরটা থাকবি তো ওখানে ?

হ্যাঁ, মাথা নিচু করে বললো রতন।

তিরিশ শিলিং দিবি বেটিকে, আর বেশি পয়সা রাখিস না কাছে, শুধু দশ শিলিং-এর একটা নোট।

কেউ খুন-টুন করবে না তো ?

এ কি তুই চিৎপুর পেয়েছিস নাকি রে ?

তুমি চলো না, পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে ?

মারবো এক থাবড়া, গর্জে উঠলো দীনবন্ধু, কচি ছেলে নাকি রে তুই যে আব্দার ধরেছিস ? রইলি লণ্ডনে এতোদিন তবু তোর চোখ ফুটলো না ? যা যা, যা করবার করে দিয়েছি আর বিরক্ত করিস না আমাকে···

রতন আর কিছু বললো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠিক রাত্তির দশটার সময় খুঁজে বের করলো সে বাড়ি। ছমছম করে উঠলো তার সমস্ত শরীর। সরু গলি। চারপাশ নিস্তব্ধ। তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক। আর একটু দূরে ঘোরাঘুরি করছে পুলিশ। রতন একবার ভাবলো, কাজ

নেই বাবা, ফিরে যাই। বিদেশে বিভুঁয়ে শেষে কী বিপদে পড়বো কে জানে! কিন্তু না, কী ভাববে তাহলে দীনবন্ধু! ফোন করে সব ঠিক করেছে সে। এখন যদি ও ফিরে যায় তাহলে নাম খারাপ হবে ভারতীয়দের। মেয়েটি ভাববে তাদের কথার ঠিক নেই। এমন অনেক আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে রতন একসময় ঢুকে পড়লো সেই বাড়িটার ভেতর। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। তার পায়ের শব্দে চারপাশ যেন বিচলিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ আর-একজনের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলো রতন। কে যেন ওপর থেকে নেমে আসছে। সর্বনাশ! কেউ যদি এই অন্ধকার ভাঙা বাড়িতে গলা টিপে খুন করে ফেলে তাকে, একটি লোকও টের পাবে না। কাল সমস্তদিন বাড়ি না ফিরলে পরশু হয়তো দীনবন্ধু তার খোঁজ করতে পারে, কিন্তু ততক্ষণে রতনের লাস গুণ্ডারা কোথায় চালান করে দিয়েছে কে জানে!

সে মূর্তি রতনের একেবারে কাছে এসে পড়লো। তার চেহারা দেখে মাথা ঘুরে গেলো রতনের। ছ-ফুট-লম্বা নিগ্রো। সে আবার হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সেই অন্ধকারে কুচকুচে রঙের মাঝে ঝকঝক করছে তার শাদা দাঁত। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর সে হয়তো বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে রতনের ওপর! লোকটা নিশ্চয়ই মদে চুর। এখন যে আর পালিয়ে যাবারও উপায় নেই। হে মা কালী, রক্ষা করো—রতনের সমস্ত শরীর কাঁপছে।

কিন্তু কিছুই হলো না। 'হ্যালো জেন্টেলম্যান, গুড ইভিনিং' বলে সেই নিগ্রো নীচে নেমে গেলো। তবু এতো ভয় পেয়েছিলো

রতন যে তাকে উত্তরে 'গুড ইভিনিং' বলবারও সাহস পেলো না। যন্ত্র-চালিতের মতো সে ওপরে উঠতে লাগলো।

কলিং-বেল টেপবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো বেটি। এসো ডার্লিং, তোমারই অপেক্ষা করছি। তুমিই তো ফোন করেছিলে আজ ?

হ্যাঁ, সেই শীতেও যেন ঘেমে উঠলো রতন।

এসো, মৃদু হেসে হাত ধরে বেটি রতনকে নিয়ে গেলো শোবার ঘরে।

কী সুন্দর সাজানো ঘর! রতন অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এই অল্ডগেটের ভাঙা বাড়িতে বেটিও তো থাকে। কিন্তু তার ঘরের সঙ্গে রতনদের ঘরের কী আকাশপাতাল তফাত! ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রোব্, বইয়ের শেলফ, আর কী রকম ঝকঝকে পুরু বিছানা। খাটের কাছেই টেলিফোন। হয়তো অনেক পয়সা বেটির—রতন মনে মনে ভাবলো একবার।

আজও থেকে থেকে তার বেটির কথা মনে হয়। আর সে ভাবে, বিলেতে এসে প্রথম প্রথম কী বোকামিই না করেছে! মেমসাহেব দেখলেই তার ভালো লেগেছে। বাছবিচার করবার ক্ষমতা ছিলো না। কী-ই বা এমন দেখতে ছিলো বেটি! মোটাসোটা, বেঁটে, গোলগাল। সস্তা রঙ মেখে কাঠের পুতুলের মতো হাত ধরেছিলো তার, তবু তাকে কী ভালোই যে লেগেছিলো রতনের!

আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তোমার কাছে আসবো বেটি।

অমন কথা সবাই বলে, হেসে বললো বেটি।

না আমি সত্যি আসবো, তোমাকে ভালোবাসবো—তুমি দেখে নিও—

তোমার মতো অনেক ইণ্ডিয়ান আমাকে বলেছে ওকথা, কিন্তু কেউ আর ফিরে আসে নি। এদেশে কি মেয়ে-বন্ধুর অভাব আছে? হয়তো কতো ভালো বন্ধু পেয়েছে তারা।

চাই না আমি অন্য মেয়ে-বন্ধু।

অমন কথা সবাই বলে গো সবাই বলে।

মুখ ভার করে রতন বললো, বিশ্বাস না করলে কি করবো বল···

আচ্ছা গো আচ্ছা, রতনের পাশে বসে বললো বেটি, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।

রতন খুশী হয়ে বললো, আবার যখন আসবো বলো কী আনবো তোমার জন্যে?

ইণ্ডিয়ান পারফিউম আছে তোমার কাছে? আমার এক ভারতীয় বন্ধু দিয়েছিলো একবার আমাকে—বড়ো চমৎকার।

পারফিউম কী? বোকার মতো রতন জিজ্ঞাসা করলো।

তুমি কী গো? হেসে রতনের গায়ে ঢলে পড়ে বলেছিলো বেটি, পারফিউম কী না জেনে এসেছো মেয়ে-বন্ধুর বাড়ি!

রতন লজ্জা পেয়ে বেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। না, ইংরেজীটা ভালো করে না শিখলে কিছুতেই চলবে না এদেশে। বাবুদের ছেলেদের মতো যদি দেশে থাকতে শিখতে পারতো তাহলে কতো সুবিধা হতো তার।

তুমি আমাকে ইংরেজী শেখাবে বেটি?

ওমা, আমার সময় কোথায়? জানো আমার নিজের সমস্ত খরচ নিজে চালাতে হয়? দিনের বেলা চাকরি করি মাংসের দোকানে। তুমি এদেশে থাকবে তো কিছুদিন?

হ্যাঁ।

তবে আর ভাবছো কেন ? নিজের থেকেই শিখে নেবে ইংরেজী। যাক গে, রাত্তিরে থাকবে তো আজ, অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। টাকা এনেছো তো ? দেখ, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা নিতে আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু করবো কী বলো, নিজের খরচ নিজে চালাতে হয় যে—

টাকা দেবো তোমাকে এখন ?

দয়া করে, যদি কিছু মনে না করো—

রতন পকেট থেকে টাকা বের করে বেটিকে দিলো। বেটি টাকা গুনে নিয়ে তার সামনেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলো। রতন লক্ষ্য করলো বেটি কিন্তু চাবি দিলো না ড্রয়ারে।

এবার ঘুমনো যাক কী বলো ?

হাই তুলে রতন বললো, বেশ।

আলো নিবিয়ে দেবো ?

না না, অন্ধকারে আমার বড়ো ভয় করে ।

গ্যাস বন্ধ করে হেসে বললো বেটি, তুমি একটি দুধের বাছা !

রতন হাসলো। ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট।

অনেক রাত্তিরে রতন আর একবার ঘড়ি দেখলো। কিন্তু রাত্তির আর নেই তখন। ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচটা। বেটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে। দেখলে মনে হয় না সহজে তার ঘুম ভাঙবে।

এক মুহূর্তের জন্যও চোখ বুজতে পারে নি রতন। কী নিঝুম বাড়ি! কখন কী হয় বলা যায় না। পায়ের শব্দে সে চমকে চমকে

উঠেছে। আবার যদি সেই নিগ্রোটা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়! এমন করে রাত্তিরে আর কখনও থাকবে না কোনো মেয়ের বাড়ি। কোথা থেকে কী বিপদ আসে কে জানে! একটা তুঃস্বপ্নের মতো সেই নিগ্রো পেয়ে বসেছে রতনকে। নাঃ, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

খুব সাবধানে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো রতন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধলো, কোটপ্যাণ্ট পরে, ওভারকোট গায়ে চাপালো। তারপর বেটির দিকে ভালো করে তাকালো একবার। কিছুতেই সে জাগবে না এখন। খুব আস্তে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুললো রতন। সাবধানে তুলে নিলো সব ক-টি নোট। তারপর ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা খুলে খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলো। রাস্তায় বেরিয়েই দেখে সেই শীতের ভোরে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পুলিশ। ওভারকোটের পকেটে নোটগুলো শক্ত করে চেপে ধরে প্রায় পুলিশের গা ঘেঁসে ভোরের সেই ভরা-কুয়াশায় নিমেষে অদৃশ্য হলো রতন।

গ্রীনপার্কে জলে যাওয়া তু-পাউণ্ড উদ্ধার করে খুব বাহাত্তুরি করেছে এমন ভাব নিয়ে গল্পটা সবিস্তারে দীনবন্ধুকে বললো রতন। তারপর এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন, এবার আর আমাকে গাধা বলবে?

রতন ভেবেছিলো দীনবন্ধু তার পিঠ চাপড়ে বলবে, সাবাস ভাই, এই তো লায়েক হয়ে পড়েছিস দেখছি—

কিন্তু দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঘাবড়ে গেলো। গল্প

শুনতে শুনতে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলো দীনবন্ধু। লাল হয়ে গেলো তার সমস্ত মুখ।

রতন বুঝতে পারলো না কেন অমন করছে ও, আর কী অন্যায় করেছে সে।

ফেটে পড়লো দীনবন্ধু, ব্লাডি ফুল ইস্টুপিড—

গাল দাও কেন? জানতে যাচ্ছে কে?

তোর বাবা, এটা তোর বাবার দেশ, বুঝলি সোয়াইন। একি তোর নোয়াখালি পেয়েছিস তুই? এসব ছ্যাঁচড়া কাণ্ড এখানে কেউ করে না। আর করলে তার নিস্তার নেই। লণ্ডনের পুলিশকে তুই চিনিস না। বুঝলি, ওরা ম্যাজিক জানে, মন্তর জানে রাস্কেল। এরা তোর গিরিধারী চৌবে তেওয়ারী নয়। ভাবছিস লণ্ডন-পুলিশকে ফাঁকি দিবি তুই?

আর কখনও এ কাজ করবো না দীনদা—

আরে এ যাত্রা বাঁচ আগে, তারপর পরের কথা। ছি ছি ছি, কী করলি তুই বল তো! ইণ্ডিয়ানদের নাম খারাপ করলি—কী ভাববে মেয়েটা ইণ্ডিয়ানদের?

ওখানে আর যাবো না আমি।

তুই না যাস আমি তো যাবো, আমি না যাই ছোট্টু তো যাবে, সে না যায় আর কোনো দেশের লোক তো যাবে। ইণ্ডিয়ান দেখলে এখন মেয়েটা তার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে বল তো? ছি ছি ছি—

টাকাগুলো ফেরত দিয়ে আসবো গিয়ে?

থাক আর বেশি বুদ্ধি দেখিয়ে কাজ নেই। শোন রতনা, ভালো কথা বলি তোকে। বিদেশে একটা লোককে দিয়ে লোকে সমস্ত

দেশের লোককে বিচার করে। খুব সাবধানে এখানে চলাফেরা করতে হবে তোকে, না হলে ফিরে যা দেশে। দেখিস না, এখানে কেউ ঠকায় কাউকে? রাস্তার মোড়ে কাগজওয়ালা কাগজ রেখে বাড়ি চলে যায়, লোকে ঠিক ঠিক কাগজের দাম রেখে কাগজ তুলে নেয়, বিকেলবেলা কাগজওয়ালা এসে পয়সা পকেটে ভরে। কেউ তুলে নেয় অমনি একটা কাগজ? কিংবা পয়সাগুলো চুরি করে? কেউ এখানে ঠকায় না কাউকে। আর ঠকালে তার নিস্তার নেই— দু পেনির বদলে জরিমানা দিতে হয় দু পাউণ্ড। ধরা সে পড়েই। লণ্ডন-পুলিশকে ফাঁকি দিতে পারে এমন ঘুঘু জন্মায় নি এখনও—

আমার কি হবে দীনদা? শেষে কি বিদেশে জেলে গিয়ে পচবো? এবারটি আমাকে বাঁচাও। তুমি অনেকদিন আছো এখানে—ইচ্ছে করলে সব পারো। পায়ে পড়ি তোমার—আর কখনো অমন করবো না। যেমন করে হোক আমাকে বাঁচাও। প্রায় কেঁদে ফেললো রতন।

শান্ত হয়ে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললো দীনবন্ধু, অবশ্য পুলিশে খবর দিয়ে গোলমাল করবে না মেয়েটা। কেননা ও ব্যবসা করবার আইন নেই লণ্ডনে। তবু পাড়ার মেয়ে, পথে ঘাটে দেখা হলে কী বলবি তুই? আর, গুণ্ডা লাগাতে পারে তো তোর পেছনে— ওদের হাতে অনেক ভাড়াটে লোক থাকে—

আমি অনেকদিন রাস্তায় বেরোবো না, তাহলে আমাকে ভুলে যাবে ও।

ইণ্ডিয়ানকে চট করে ভুলবে না, কটাই বা কালা আদমি আছে এ পাড়ায়।

তাহলে?

মর তুই, আমি কী করবো? ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আনলে আমি নিরুপায়!

কিন্তু শেষ অবধি কিছুই হলো না। হয়তো বেটি ভেবেছিলো নোটগুলি অন্য কোথাও রেখে খুঁজে পাচ্ছে না। রতন যে চুরি করতে পারে সম্ভবত সেকথা সে ভাবতেই পারে নি। অন্তত, এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হলো রতন।

জাহাজে চাকরি করে জমানো টাকা প্রায় ফুরিয়ে এলো রতনের। এবার এখানে একটা চাকরির চেষ্টা না করলেই নয়। দীনবন্ধুর কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে রতন নানা জায়গায় চেষ্টা করতে লাগলো।

সেই ঘটনার পর থেকে আর কোনো মেয়ের বাড়ি যায় নি রতন। ভয়ে নয়, বিতৃষ্ণায়। নিজের ওপর তার কেমন যেন একটা ঘেন্না ধরে গেলো। আর অতো খরচ করবার মতো পয়সাও তার নেই। তার চেয়ে, যেমন দীনবন্ধুর মুখে শুনেছে, এমন একজন মেয়ের দেখা যদি পাওয়া যায়, যে অমন ব্যবসা করে না, ভদ্র ঘরের মেয়ে, যে ভালোবাসবে রতনকে আর রতনও যাকে ভালোবাসবে। শুধু পয়সার ঠুনকো সম্পর্ক নয়—সত্যিকার ভালোবাসা। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু উপহার দিলেই চলবে। দরকার হলে রতনকে সে-ই দেবে পয়সা। এমন নাকি কতোই হয় লণ্ডন শহরে। সেই রকম একটা ভালো মেয়ে খুঁজে বের করবে রতন। তারপর বিয়ে করবে তাকে। ভাবতেও এতো ভালো লাগে তার! কিন্তু ইংরেজীটা ভালো করে শিখতেই হবে। না হলে মেমবউ-এর সঙ্গে মনের কথা বলবে কেমন করে! অবশ্য বিয়েটা একবার করে ফেলতে পারলে আর তার ভাবনা নেই, বউই তাকে

শেখাবে ইংরেজী। যেটা সে বুঝবে না বউ তাকে বুঝিয়ে দেবে সহজেই।

বার বার দুঃখ করে রতন, দেশে থাকতে বাবুদের ছেলেদের মতো ইংরেজীটা কেন শিখলো না। তবু চারপাশে অনেক ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে রতনের মনে হয় এদেশের মেয়ে বিয়ে না করলে কিছুতেই চলবে না তার। দেশের কতো লোক তো মেম বিয়ে করে, রতনই বা করবে না কেন! কোটপ্যাণ্ট পরে টাই বেঁধে জুতো মোজা পায়ে দিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে তার নিজেকে ছোটোলোক বলে মনে হয় না একবারও।

একদিন এই লণ্ডন শহরেই সে তার বউ খুঁজে পাবে—এই মনে করে দিশাহারার মতো ক্ষুধার্ত মন নিয়ে সমস্ত নগর চষে ফেলতে লাগলো রতন। সন্ধ্যেবেলা পাবলিক বারে গিয়ে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো, কিন্তু কেউ কথা বললো না তার সঙ্গে। মেয়েরা প্রত্যেকেই এসেছে তাদের ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে। যে-মেয়েরা গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলো, তারা কেউই যে ভদ্র নয় সেকথা রতন তাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো। আজকাল সে বুঝতে পারে। তবু আশা হারালো না রতন—একদিন না একদিন কোনো ভালো মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হবেই।

সুযোগ বুঝে একদিন সাবধান করে দিলো দীনবন্ধু, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না, ভদ্র বউ-ঝির গায়ে হাত দিলে পুলিশের হ্যাঙ্গামে পড়বি।

ঘোড়ার ডিম পড়বো! গায়ে হাত দিলে এদের আবার জাত যায় নাকি দীনদা? পার্কে-পার্কে দিনের আলোয় কী কাণ্ড করে দেখো না?

ওরা হলো লভার, বুঝলি ?

আমিও একটা লভার জুটিয়ে নেবো।

ভুলে যাস না তুই কালা আদমি—

তাতে ক্ষতিটা কী ? সাহস বেড়েছে আজকাল রতনের।

বলি জেলে যাবার সাধ হয়েছে রে ?

সব বাজে কথা তোমার, একটু বিরক্ত হয়ে রতন বললো, এখানে কেউ কথায় কথায় পুলিশে খবর দেয় না—

ক-দিন আছিস এখানে ? চেঁচিয়ে উঠলো দীনবন্ধু, আমি এখানে আছি বারো বছরের বেশি, বলি আমার থেকে বেশি জানিস নাকি রে তুই ? শেষে বিপদে পড়ে নাকি কান্না কাঁদলে মারবো এবার লাথি—

রতন উত্তর দিলো না। সব সময় বড়ো সর্দারি করতে ভালোবাসে দীনবন্ধু। রাগ হয় তার আজকাল।

একদিন দেখা পেলো রতন তার মনের মানুষের। রোদ উঠেছিলো সেদিন। লণ্ডনের ঠাণ্ডা সূর্যের হালকা রোদ। হাইড পার্কে বেঞ্চে বসে রতন ছেলেমেয়েদের নৌকো বাওয়া দেখছিলো। চারপাশে প্রায় খালি গায়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে কতো ছেলেমেয়ে। কোথাও একজন আর-একজনকে জড়িয়ে ধরে গদগদ ভাষায় কী যেন বলে যাচ্ছে। কী বলে ওরা ? রতন ভাবে, নিশ্চয়ই প্রেমের কথা। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে রতনের। তার দিকেও অনেকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে।

একটি মেয়ে এসে তার পাশে বসলো। তাড়াতাড়ি একটু সরে গেলো রতন। একটু পরে সিগ্রেট বের করে তার দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বললো, খাবে? অবাক হয়ে মেয়েটি বললো, না ধন্যবাদ।

খাও খাও—

সিগ্রেট নিয়ে মেয়েটি আবার বললো, ধন্যবাদ।

ছাখো, অদ্ভুত ইংরেজীতে রতন বললো, এসেছি তোমাদের দেশে কিন্তু বন্ধু-বান্ধব নেই—

রতনের ইংরেজী একবর্ণও না বুঝে বাধা দিয়ে মেয়েটি বললো, পার্ডেন? মাথা চুলকে ঢোঁক গিলে বললো রতন, আমি ইংরেজী জানি না। হেসে মেয়েটি চুপ করে সিগ্রেট টানতে লাগলো। একটু পরে আবার বললো রতন, তুমি আমাকে শেখাবে ইংরেজী?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ভারতবর্ষের লোক বুঝি?

হ্যাঁ।

ছাত্র? ফস করে রতন বলে ফেললো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেওয়ার জন্য বললো, তুমি আমাকে ইংরেজী শেখালে বড়ো ভালো হয়। এখন তো গ্রীষ্মকাল—পার্কে বসেই তুমি আমাকে শেখাতে পারো—

মেয়েটি কিছু না বুঝে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আজ রাত্তিরে তুমি ডিনার খাবে আমার সঙ্গে?

ধন্যবাদ।

খুশিতে মেয়েটির কাছে সরে এলো রতন। এতোদিন পরে সে তার মনের মতো সঙ্গীর দেখা পেয়েছে। সাহসী হয়ে বললো, তুমি আমার বন্ধু। মেয়েটি কী বুঝলো কে জানে, সে শুধু বললো, ধন্যবাদ। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, আমার এক ভাই ভারতবর্ষে ছিলো—

ঘাবড়ে গিয়ে রতন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ?

ভারতবর্ষে—তোমাদের দেশে।

না না, মানে কোন ভারতবর্ষে ?

কোন ভারতবর্ষে ? হেসে মেয়েটি বললো, ও তুমি বলতে চাচ্ছো ভারতবর্ষের কোন জায়গায় ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—

সে একটা খুব বড়ো নাম, আমার মনে পড়ছে না—

নোয়াখালি নয় নিশ্চয় ?

পার্ডেন ?

জায়গার নাম নোয়াখালি নয় ?

না না, আমার মনে পড়ছে না এখন, উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, আমাকে যেতে হবে এবার—

কিন্তু ডিনার ?

ও হ্যাঁ, একটু সামলে নিয়ে বললো মেয়েটি, কটা বেজেছে এখন ?

পাঁচটা।

ধন্যবাদ, তুমি এই বেঞ্চে দয়া করে বসে থাকো, আমি সাড়ে সাতটার সময় ফিরে আসবো। ঠিক আছে ?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করলে না তো ?

না না।

বিশেষ কাজের জন্যে আমাকে যেতেই হচ্ছে—

তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা কোরো।

বেশ। তারপর 'চিয়ারিও' বলে মেয়েটি চলে গেলো। যতোক্ষণ

তাকে দেখা যায় রতন তাকিয়ে রইলো তার দিকে। অনেক দূরে ভিড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেলো। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ঘড়ি দেখলো রতন, তার ফিরে আসতে আর কতো দেরি আছে। ইংরেজের কথার এদিক-ওদিক হবে না নিশ্চয়ই। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় সে ঠিক ফিরে আসবেই। এই জায়গা চিনতে পারবে তো? এই বেঞ্চ, ফুলের গাছ, আর সামনে ওই হ্রদ। সেখানে ছেলেমেয়েরা তখনও নৌকো বাইছে।

বিরহ-যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটিয়ে দিলো রতন আড়াই ঘণ্টা। ঘড়িতে এখন ঠিক সাড়ে সাতটা। উশখুশ করতে করতে রতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যতো মেয়ে আসে সে ঘাড় উঁচু করে দেখে আর ভাবে ওই বুঝি তার বন্ধু আসছে। আটটা বাজলো—সাড়ে আটটা হলো—নটার কাছে এলো ঘড়ির কাঁটা, কিন্তু বন্ধু এলো না।

আশায় বাজ পড়লো রতনের। কথা দিয়ে কথা রাখলো না কেন সে! তার মুখ দেখে সত্যি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো রতন।

হয়তো এতো বড়ো পার্কের এই জায়গার কথা ভুলে গেছে মেয়েটি, কিংবা কোনো বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে, তাই আর ফিরে আসতে পারে নি। এখন আবার নতুন করে কাকে খুঁজে বেড়াবে রতন!

তারপর এমন কতো হয়েছে! কতো মেয়ে আসবো বলে আসে নি—কথা দিয়ে কথা রাখে নি। আজ তার সঙ্গে ঘুরে কাল অন্য বন্ধুর কোমর ধরে রাস্তায় যেতে যেতে দেখেও দেখে নি

তাকে। তাই আলেয়ার পেছনে আর ছোটে না রতন। একটা ক্লান্তি এসেছে তার। যন্ত্রের মতো সে যায় অল্ডগেট থেকে লেস্টার স্কোয়ার—লেস্টার স্কোয়ার থেকে অল্ডগেট। আর কোনোও দিকে মন নেই তার, মন দেবার সময়ও নেই।

আর একদিনও বিলেতে থাকতে চায় না রতন—মেম বিয়ে করবার স্বপ্নও দেখে না। শুধু কোনো রকমে দেশে ফিরে যেতে চায়। তুষারকণাগুলি বয়ে আনে শেফালির গন্ধ, আর নিঃশব্দে মনের নিবিড়ে এসে দাঁড়ায় সোনা বউ। অনেক ঘুরেছে রতন—অনেক দেখেছে। কিন্তু তার সোনা বউ-এর পায়ের কাছেও লাগে না কেউ।

রতনের সোনা বউ। কালো রঙ তার, লম্বা-লম্বা চুল, আঁটসাট দেহের বাঁধন আর টানা-টানা চোখ।

ফিসফিস রিমঝিম তুষার ঝরে।

৪

মাঝে মাঝে আইলীনকে নিয়ে বাইরে বেরোয় ভূপাল। সারাদিন এক জায়গায় ঠায় বসে থাকতে ভালো লাগে না তার। হিসেব-নিকেশ আর গ্রীলের বাকি কাজ অন্য কারুর ওপর কিছুক্ষণের জন্যে চাপিয়ে দিয়ে ডাকে, এসো আইলীন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নেয় আইলীন। আয়নায় মুখ দেখে পাউডার ঘসে, আবার নতুন করে লিপস্টিক লাগায়। তারপর ওভারকোট হাতে ঝুলিয়ে, হ্যাণ্ডব্যাগ তুলে নিয়ে ভূপালের সামনে এসে বলে, আই অ্যাম রেডি। ভূপাল তাকে সাহায্য করে ওভারকোট পরে নিতে।

সেজেগুজে রাস্তায় বেরোলে আইলীনকে দেখে কে বলবে যে সে রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, নকল মুক্তোর মালা গলায়, হাতে রিস্টওয়াচ, পরিচ্ছন্ন সোনালি চুল। দেখতে ভালোই আইলীন।

সকলের সামনে দিয়েই তার হাত ধরে বেরিয়ে যায় ভূপাল। লাঞ্চের সময় বেরোলে পিকাডিলির কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় যায় তারা। কারণ দাম বেশি বলে সেখানে 'কিউ'-এর বালাই নেই। অল্প কয়েকজন খদ্দেরের ভিড়। 'মেন্যু' হাতে দিয়ে স্মিত হেসে ওয়েট্রেস ওদের অর্ডারের অপেক্ষা করে।

বলো কী খাবে ভূপাল? আইলীন 'মেন্যু' বাড়িয়ে দেয় ভূপালকে।

আমার দেখবার দরকার নেই, তুমি যা খাবে আমিও তাই।

হেসে আইলীন বলে ওয়েট্রেসকে, টু রোস্ট বীফ্ স্ প্লিজ—

তারপর সে চলে গেলে ভূপালের দিকে তাকিয়ে বলে, এখানে আসো কেন? এতো বেশি দাম খাবারের! লায়ন্স্ কর্নার হাউসে গেলে অনেক সস্তায় দু-জনের খাওয়া হয়ে যায়।

ও বাবা, যা লম্বা 'কিউ' ওখানে, অতোক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

'কিউ'-এ দাঁড়াতে ভালো লাগে না তোমার?

একটুও না।

আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে।

তাই নাকি? ভূপালের মুখ দেখে মনে হলো সে বেশ অবাক হয়েছে। তবু বললো, আর লায়ন্স্ কর্নার হাউসে 'কিউ'-এ দাঁড়িয়েই বা লাভ কী বলো? ভেতরে গেলেও যা ভিড় সেখানে, তোমার সঙ্গে শান্তিতে কথা বলতে পারি একটাও?

কী কথা ভূপাল বলতে চায় আইলীন ভেবে পায় না। কেননা এই নির্জন রেস্তোরাঁয় বসে অনেক সুযোগ পেয়েও অন্য কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না ভূপাল। খেতে খেতে শুধু বলে, কেমন হয়েছে? ভালো লাগছে? আর কিছু চাই? একটা আইসক্রীম? চা না কফি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই খাবারের নানা আলোচনা।

একদিন কথায় কথায় বললো ভূপাল, জানো আইলীন আমাদের দেশে কেউ কাঁটা-চামচ ব্যবহার করে না।

সে কি? তাহলে খায় কী করে?

হাত দিয়ে।

বলো কী? অবাক হয়ে বললো আইলীন, সত্যি?

বললুম তো, হ্যাঁ।

আশ্চর্য দেশ তোমাদের, অদ্ভুত নিয়ম-কানুন কিন্তু। আমি যে ভাবতেই পারি না ওকথা।

আমিও ভাবতে পারি না আজকাল, ভূপাল আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

খাবার পর বিল দেবার সময় বাধে দু-জনার গণ্ডগোল। দেখি কতো হয়েছে, বলে আইলীন ঝুঁকে পড়ে বিলের দিকে। ভূপাল খাঁ করে সেটা সরিয়ে নিয়ে বলে, না, দেখতে হবেনা তোমাকে। রেগে গিয়ে বলে আইলীন, রোজ রোজ তুমি দিতে পারবে না আমার খাবারের দাম, আমারটা আমি দেবো।

আমি নেমন্তন্ন করেছি না তোমাকে?

তাতে কী হয়েছে?

ছেলে সঙ্গে থাকলে মেয়ে কখনও বিলের পয়সা দেয় না।

নিশ্চয়ই দেয়, আইলীন ব্যাগ খুলে সত্যি পয়সা বের করতে যায়। বাধা দিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে ভূপাল, আমাকে পয়সা দেখাতে যেও না আইলীন—জানো না আমার অনেক পয়সা? একথা শোনার পর আইলীন আর কিছু বলে না। অবাক হয়ে চুপ করে থাকে। ভাবে, হয়তো ভারতীয়দের ওটাই রীতি—নিজের পয়সা আছে জাহির করা দোষের নয় মোটেই ওদের কাছে।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা ওরা সিনেমা থিয়েটার ব্যালে কিংবা অপেরা দেখতে যায়। আইলীনের হাত নিজের মুঠোয় ধরে চুপ করে বসে থাকে ভূপাল—কথা বলে না। থেকে থেকে আইলীন সিগ্রেট বের করে খায়, তারই ধোঁয়ায় চোখে জল

আসে ভূপালের। সরি, আইলীন হাত দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ধোঁয়া। থাক থাক ঠিক আছে, বুকপকেট থেকে রুমাল বের করে আবার কাশে ভূপাল। বিড়ি-সিগ্রেট সে খায় নি কোনোদিন।

রাস্তায় বেরিয়ে আইলীন বলে, তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

চলো, পাবে যাই?

কিন্তু তুমি যে মদ খাও না।

কিছু যায় আসে না, আমি অন্য কিছু খাবো। আইলীনের হাত ধরে সামনের বড়ো পাবের সেলুন লাউঞ্জে গিয়ে ঢোকে ভূপাল। অনেক লোক সেখানে। কিন্তু কেউ ফিরেও দেখলো না তাদের দিকে।

পিকাডিলির ঝকঝকে সাজানো 'পাব্' ভরে উঠেছে নরনারীর কলগুঞ্জনে। কতো ছেলে, কতো মেয়ে! বসে থাকো রাত্তির এগারোটা অবধি, যতো খুশি মনের কথা বলো, বাধা দেবে না কেউ।

আইলীনের জন্যে জিন আর লাইম আর নিজের জন্যে শুধু লেমন-স্কোয়াশ নিয়ে ভূপাল বসে পড়লো। মদ একেবারেই খায় না সে। আইলীন হেসে বললো, তেষ্টা পেলে তোমাদের দেশে লোক ঠাণ্ডা জল খায়, না?

হ্যাঁ, দেখো না আমার দোকানে ইণ্ডিয়ান খদ্দেররা গ্লাস অফ ওয়াটার চেয়ে চেয়ে অস্থির করে তোলে তোমাকে।

উঃ, ঠাণ্ডা কাঁচা জল তোমরা খাও কেমন করে!

রেডিয়োয় খুব আস্তে বাজনা বাজছে, আর শোনা যাচ্ছে গেলাসের টুং-টাং শব্দ আর কতো কণ্ঠস্বর। চুক-চুক করে

লেমন-স্কোয়াশ খেতে খেতে হঠাৎ কী খেয়াল হলো ভূপালের, আইলীনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, একটা কথা আজও তোমাকে আমার বলা হয় নি আইলীন।

কী কথা ?

এখন বলবো ?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি অমন ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন ? আমাকে তোমার ভয় কী ভূপাল ? ভূপাল কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলো, তারপর আইলীনের হাত চেপে ধরে ফস করে বলে ফেললো, আমার বিয়ে হয়ে গেছে আইলীন।

খিলখিল করে হেসে উঠে বললো আইলীন, কবে থেকে জানি আমি সেকথা।

জানতে তুমি ? বিস্ময়ে চোখ বড়ো হলো ভূপালের।

হ্যাঁ, বহুদিন।

কেমন করে ? আমি কি বলেছিলাম তোমায় ?

না গো।

তবে কেমন করে জানলে তুমি ?

সেকথা বলতে পারবো না।

দয়া করে বলতেই হবে তোমাকে, আইলীনের হাত শক্ত করে ধরে মিনতি করলো ভূপাল।

কিন্তু আমি যে তাকে কথা দিয়েছি—

হুঁ, গম্ভীর হয়ে বললো ভূপাল, আর বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

বলো তো কে ?

রতন।

হ্যাঁ, হেসে বললো আইলীন, ওকে বোলো না একথা, ও আমাকে বিশ্বাস করে ভূপাল।

না বলবো না, খুব গম্ভীর গলায় বললো ভূপাল, আমার চাকরের সঙ্গে কি মারামারি করবো তোমাকে নিয়ে ?

স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে বললো আইলীন, কিন্তু আমিও যে তোমার চাকরানী সেকথা ভুলে যেও না।

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললো ভূপাল, আমাকে মাপ করো, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

তোমার স্ত্রী কোথায় এখন ?

বাংলাদেশে।

তুমি এখনও তাকে ভালোবাসো ?

হ্যাঁ—না—

তাকে আনাও না কেন এখানে ?

লিখেছি তো, কিন্তু এদেশে আমাদের দেশের মেয়েদের অসুবিধা অনেক।

তোমাদের দেশে তো খুব গরম ?

হ্যাঁ।

ছেলেমেয়ে আছে তোমার ?

একটু লজ্জিত হয়ে ভূপাল বললো, দুটি মেয়ে তিনটি ছেলে।

ও বাবা, হাসলো আইলীন, পাঁচ সন্তানের বাপ তুমি। একটু থেমে আবার বললো, তাদের জন্যে মন খারাপ লাগে না তোমার ?

প্রথম প্রথম লাগতো, এখন আর লাগে না।

কবে ফিরবে দেশে ?

হয়তো আর ফিরবো না।

কেন ?

ফস করে মিথ্যা কথা বললো ভূপাল, স্ত্রী ভালোবাসে না আমাকে, কার কাছে যাবো !

তবে তাকে ডিভোর্স করো না কেন ?

ভূপাল হাসলো। উত্তর দিতে পারলো না কিংবা ইচ্ছে করেই দিলো না, কে জানে। আর ঠিক সেই সময় বারমেইড চেঁচিয়ে উঠলো, লাস্ট অর্ডার—লাস্ট অর্ডার প্লিজ—

তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়বার পর আজ সকাল থেকে সবে বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ঝিরঝির টিপটিপ করে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। কখনও থামে কখনও ঝরে। রাস্তায় ঝরা-তুষার শাদা কাদার মতো জমে উঠেছে। গাড়ি চললে চাকা বসে যায়, হাঁটতে গেলে সাবধান হতে হয়, একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। গাড়ির চাকার ময়লায় আর মানুষের জুতোর চাপে সেই শুভ্র জমাট তুষার মলিন হয়ে উঠেছে।

ভারী ওভারকোট আর বুট পরে চৌধুরী প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ইণ্ডিয়া গ্রীলের সামনে এসে দাঁড়ালো। বৃষ্টি অথবা তুষারের দিনেও ফেল্ট কখনও পরে না চৌধুরী। কেননা হাওয়ায় তার মাথা থেকে টুপি উড়ে যায় আর পথিকের সামনে লজ্জায় পড়তে হয় তাকে।

ইণ্ডিয়া গ্রীলে তখন শুরু হয়েছে লাঞ্চ টাইম। অনেক খদ্দেরের ভিড়। দিশী খাবারের তেজী গন্ধ লণ্ডনের লেস্টার স্কোয়ারেও নাকে এসে লাগছে।

দরজা ঠেলে পাপোশে ভালো করে বরফ ঝেড়ে চৌধুরী এসে দাঁড়ালো ভূপালের সামনে। বড়ো ব্যস্ত তখন ভূপাল। রতন নেই, তাকে মেনু হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে বার বার, আর থেকে থেকে ক্যাশের কাছ থেকে কিচেনের দিকে মুখ নামিয়ে চেঁচাতে হচ্ছে, থ্রি ল্যাম্ব কারিস অ্যাণ্ড ফোর রাইস প্লিজ। চৌধুরীকে খদ্দের মনে করে সে বললো, সিট ডাউন স্যার।

আমি আসছি রতনের বাড়ি থেকে।

ও রতন, আচ্ছা তার ব্যাপারটা কী? বলা নেই কওয়া নেই স্রেফ ডুব। একটু বরফ পড়লে যদি এ রকম কামাই করে, তাহলে আমি সামলাই কেমন করে বলুন তো?

বরফ পড়বার জন্যে নয়, বেশ আস্তে বললো চৌধুরী, আমি ভালো করে সব জানি না, পাড়ার একটা লোকের কাছ থেকে শুনলাম—থামলো চৌধুরী।

আহা ঢোঁক গিলছেন কেন, বলুন না ছাই!

ওদের পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

পুলিশ! চোখ বড়ো করে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ভূপাল, বলেন কী মশাই!

চৌধুরী যেমন শুনেছিলো, সমস্ত ঘটনা বললো ভূপালকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এখন কী করি বলুন, একটা কিছু তো করতে হবে আমাদের?

আমি কী করবো, আর সময়ই বা কোথায় আমার? ইডিয়ট এক-একটা, এতোদিন রইলো লণ্ডনে অথচ এখনও শিখলো না কিছু—

তাহলে কী করি আমি?

একটু ভেবে ভূপাল বললো, আচ্ছা, সী-মেন্ আছে কেউ ওদের মধ্যে ?

হ্যাঁ, বিষ্টু বেচ্চো মুন্দ শিবে—

ব্যস ব্যস ওতেই হবে, আর ভাবনা নেই। এক কাজ করুন, ইণ্ডিয়া হাউসে কর্তাদের গিয়ে বলুন, ওরা যা হয় বন্দোবস্ত করে দেবে।

ইণ্ডিয়া হাউসেই তো চাকরি করে দীনবন্ধু।

আরো ভালো তাহলে। কিছু ভাবনা নেই আপনার, ওরাই নিয়ে নেবে সব ভার ওদের। কিন্তু আমিও ছাই যে মুশকিলে পড়লাম এখন, রতনের সব কাজ পড়েছে ঘাড়ে—

আপনিও দয়া করে চলুন না আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসে। বড়ো ভালো হয় তাহলে, আমি একা একা কী বলতে কী বলবো—

দেখছেন আমার নিশ্বাস ফেলবার সময় নাই—কিচেনের ঘণ্টা শুনে ছুটে গেলো ভূপাল। থ্রি ল্যাম্ব্ কারিস অ্যাণ্ড ফোর রাইস তৈরি হলো এতক্ষণে।

চৌধুরী বেরিয়ে যেতে আইলীনকে ভূপাল বললো, শুনেছো রতনের কাণ্ড ?

কী হয়েছে ?

পুলিশ ধরেছে যে ওকে—

সে কি ? কী করলো ও ?

মাতাল হয়ে মারামারি করেছে—

রতন মাতাল হয় না কখনও।

বড়ো দরদ যে রতনের ওপর—

ঠিক করে বলো কী ব্যাপার ?

আমি কি মিথ্যা কথা বলছি ?

তুমিই জানো।

সত্যি বলছি পুলিশ ধরেছে ওকে।

ফিরে আসুক, ওর মুখেই আসল গল্প শুনবো।

কিন্তু ওকে আমি আর কাজ দেবো না এখানে, রেস্তোরাঁর নাম খারাপ হবে তাহলে।

দিও না, ফিক করে একটু হেসে বললো আইলীন, আমিও তাহলে কাজ ছেড়ে দেবো তোমার—

আইলীনকে অনেক সময় বুঝতে পারে না ভূপাল। তবে কি সত্যিই রতনের উপর তার দুর্বলতা আছে ? কে জানে, কে বুঝবে ইংরেজ মেয়ের মন !

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো ভূপালের, আর সে দেখলো পাশে নেই আইলীন। অনেকক্ষণ কেটে গেলো তবু ফিরে এলো না সে। ভাবনায় পড়লো ভূপাল, আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠে বসলো। গেলো কোথায় আইলীন ? বোধহয় চলে গেছে তাকে ছেড়ে। ইংরেজ মেয়ে তো—দয়া-মায়া আছে নাকি তাদের ! সব পারে ওরা। খুব শিক্ষা হলো ভূপালের। আসলে ভুল করেছে সে নিজে। কদিন থেকে সে লক্ষ্য করেছে কিছু একটা হয়েছিলো আইলীনের। হয়তো তার বিয়ে হয়েছে শুনে রেগে গিয়েছিলো। নাকি পাঁচ সন্তানের বাপ জেনে তাকে ছাড়বার মতলব করেছিলো। কী দরকার ছিলো অতো কথা খুলে বলবার ? প্রথম থেকে বললেই পারতো, স্ত্রী আছে বটে আমার, তবে সম্পর্ক নেই আমাদের কোনো, তাই তো

আমি বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখানে। এই কথাগুলো শুনলে কত খুশী হতো আইলীন। ইংরেজ মেয়ের তাতে এসে যেতো না কিছুই। থেকে থেকে বড়ো বোকামি করে ভূপাল। এতোদিন বিদেশে ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে এতো টাকা করলো, অথচ একটা অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে একটু মগজের বুদ্ধি খরচ করে কেমন করে কথা বলতে হয় তাই শিখলো না এখনো। শুধু শুধু সাধু সাজতে গিয়ে অমন সুন্দরী মেয়েটাকে হারালো।

হঠাৎ তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো রতনের ওপর। তার কী মাথাব্যথা হয়েছিলো বাহাদুরি করে ভূপালের হাঁড়ির খবর আইলীনকে দেবার? হোক বেটার জেল—দশ বছরের জেল। ভূপাল সবচেয়ে বেশি খুশী হবে তাহলে।

সে আর খাটে বসে থাকতে পারলো না। উঠে আলোর সুইচ টিপলো। কোনো চিঠিপত্র রেখে গেছে নাকি আইলীন টেবিলের ওপর? না। তার কাপড়-জামা-জিনিস সবই তো রয়েছে যেমনকার তেমন। তবে ব্যাপারটা কী? ওপরে রেস্তোরাঁয় আলো জ্বলছে যেন। দেখাই যাক না ওপরে গিয়ে। হয়তো কেউ নেই। বেরিয়ে যাবার সময় আলো নেবাতে ভুলে গেছে আইলীন? তবু ড্রেসিং-গাউন পরে পা টিপে টিপে সটান ওপরে ওঠে এলো ভূপাল। আর তখুনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। একটু দূরে বসে প্লেট সামনে নিয়ে হাত দিয়ে খাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আইলীন, আর খাবারে হাত দিতেই বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার মুখ।

আইলীন, আনন্দে চিৎকার করে ডাকলো ভূপাল। চমকে

উঠে ভূপালকে দেখতে পেয়ে আইলীন বললো, কেন এলে এখানে—কেন দেখলে আমাকে—

তার কাছে এগিয়ে ভূপাল বললো, তোমাকে ছেড়ে কোনোদিনও আমি দেশে ফিরে যাবো না—আজ থেকে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই আইলীন !

ভুল উচ্চারণে অনর্গল ভুল ইংরাজী বললেও ভূপালের মনের ভাব আইলীন স্পষ্ট বুঝতে পারে। আজও পারলো। সে মাথা রাখলো ভূপালের বুকে।

রাত কতো কে জানে ! কেননা সেই ঘরের ঘড়ির ওপর পড়েছে অন্ধকার। কিছুতেই কাঁটা দেখা যাচ্ছে না।

ইণ্ডিয়া হাউসে খুব বেশি দেরি হয় নি চৌধুরীর। সেখানকার এক বাঙালী চাকুরের কাছে সে খুলে বলেছে সমস্ত ব্যাপার। বাঙালী বাবু আশ্বাস দিয়েছেন। কাজেই বিচলিত হবার কিছু নেই। শিগগিরই ফিরে আসবে ওরা।

ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক মিনিট হেঁটে চৌধুরী এসে দাঁড়ালো ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর। বেলা তিনটেও বাজে নি তখন কিন্তু প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে ম্লান ফ্যাকাশে আকাশ। বৃষ্টি পড়ছে না আর—বরফও বন্ধ। তবু ভারী ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যায় দেহ। টেমস-এর হাওয়া পুরু গরম জামা ভেদ করেও গায়ে যেন তীর বিঁধিয়ে দেয়।

নদীর এপাশে-ওপাশে অনেক ছোটো-বড়ো আপিস। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। পোলের তলায় নদীর পাশের রাস্তার নাম ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট। অনেকদূরে আর-একটা ব্রিজ দেখা যায়, চৌধুরী জানে তার নাম ব্লাকফ্রারারস্‌ ব্রিজ। আর তারও পরে, সেটা দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু চৌধুরী জানে, আছে লণ্ডন ব্রিজ। ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু হাওয়ার এতো জোর যে চৌধুরীর মনে হচ্ছে সবই চলেছে ব্রিজের তলায় ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে। টেমস নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় তার মনে হয়, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। কিন্তু সাঁতার জানে সে, তাই

নিস্তরঙ্গ টেমস্-এ ঝাঁপ দিলেও মরবে না। তবু মরতে সাধ হয় তার।

হয়তো আর কোনোদিনও দেশে ফিরে যাবে না চৌধুরী। ফিরবে না বলেই অনিশ্চিতের ওপর ভর করে সাত হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে সে। দেশে আর তার কোনোই আকর্ষণ নেই।

চৌধুরীর বাড়ি জলপাইগুড়ি। আমবাগানের কাছে ছিলো তার মনিহারী দোকান। ছেলেবয়সে বিয়ে হয়েছিলো তার। নোলক-পরা ছেলেমানুষ বউ মালতী ভালো করে কথা বলতে পারতো না। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকতো।

বউ গেলো বাপের বাড়ি মাসখানেকের জন্য। মালতীর বাপের বাড়ি ডেঙ্গুয়াঝোড়া, জলপাইগুড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। ফিরে এসে এক রাত্তিরে চৌধুরীর পায়ের ওপর পড়ে বললো, বাবা-মা তোমারে বলতে মানা করছে, কিন্তু না কয়ে থাকতে পারি নাকি আমি গো ?

আঃ, কাঁদো কেন, কী কথা বলো ?

মাপ করবা কও, সত্যি কইছি কোনো দোষ নাই আমার—

ওঠ ওঠ, হইছে কি কও ?

একটু থেমে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে মালতী বললো, হাত ধরছিলো শুধু আমার একটা, কালীর দিব্যি আর কিছু করে নাই—

কেটা হাত ধরছিলো ?

সেই লোকটা—

খোলসা কইরা কও, খুন করুম আমি—

কারে—আমারে ?

এইবার চৌধুরী বজ্রমুষ্টিতে মালতীকে তুলে ধরে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলো, কারে দিয়া হাত ধরাইছিলা কও ?

আমি ধরামু কেন ? শুকনো ভাঙা গলায় বলেছিলো মালতী, জল লয়ে ফেরার পথে খপ কইরা আমার হাত টাইন্যা ধরলো—

থামো, কে সে কও ?

আমি জানি না, কখনও দেখি নাই তারে। ইয়া বড়ো বড়ো গোঁফ তার।

তোমার বাপ জানে একথা ?

হ, জানে।

তবে আবার তোমারে পাঠালো যে আমার ঘরে ?

অবাক হয়ে মালতী জিজ্ঞেস করেছিলো, কী কও তুমি ?

মুখ দেখতে চাই না তোমার।

মাপ করবা না তুমি ?

বেশ্যারে লয়ে ঘর করবো কেমনে ?

সাদা হয়ে গিয়েছিলো মালতীর মুখ। কাঁপতে কাঁপতে সে শুধু বলেছিলো, এতো বড়ো কথা কও তুমি—কী দোষ আমার তাই কও ?

এর পরেও কও দোষ নাই ?

কোথায় যাবো আমি তবে ?

যেখানে খুশি। আমার ঘরে তোমার থাকা আর চলবো না, পষ্ট কয়ে দিলাম আমি।

কোথায় থাকবো তাই কও ?

সরম নাই তোমার ? যারে দিয়ে হাত ধরাইছিলা তার কাছে যাও। তারে না পাও কড়লা নদীতে যাও —

বন্যার বেগে সে-রাত্তিরে কড়লা ভয়ঙ্কর। মালতী সত্যি সেখানে গেলো। আর ফিরে এলো না। উদ্দাম নদী বুকে বয়ে নিয়ে গেলো তাকে—কেউ জানে না কোথায়।

ভালোই হলো। বড় খুঁতখুঁতে চৌধুরী। তাকে নিয়ে কিছুতেই আর ঘর করতে পারতো না। যাকে স্পর্শ করেছে অন্য পুরুষ তাকে সতী বলে আর কেমন করে সে ভালোবাসবে? কিন্তু তারপর গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে অনেকবার ঘুম ভেঙে গেছে চৌধুরীর। এ আওয়াজের কথা জানে সে। কয়েক মিনিট পর পর অমনি তোপের মতো শব্দ হয় তিস্তা নদীর মধ্যে থেকে। কেউ জানে না কেন হয় সে-আওয়াজ। সে-শব্দ শুনে চমকে ওঠে চৌধুরী।

তবে কি মালতী তিস্তায় ডুবেছিলো?

কিন্তু তাকে ভুলতে পারলে না চৌধুরী—কিছুতেই না। তিস্তার আওয়াজ আর মালতীর স্মৃতি তাকে ঘুমহীন করে তুললো। দেশ ছেড়ে পালাতে চাইলো সে। মালতীকে ভোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। অনেকবার এই কথা উচ্চারণ করলো, তারা তারা, শক্তি দাও—শক্তি দাও।

ডেপুটি কমিশনারের ছেলে চাকরি করতো নৌ-বিভাগে। তাকে ধরে জাহাজে স্টোকারের চাকরি পেলো চৌধুরী, আর তারপরেই মনিহারী দোকান বেচে দিয়ে দেশ ছাড়লো। কিন্তু মাঝে মাঝে দুঃখ করে চৌধুরী। কেন এমনি করে বিলেতে এলো সে! যদি দেশে পড়ে থাকতো তাহলে হয়তো এতোদিনে মালতীকে ভুলে যেতে পারতো। একটা মেয়েকে লোকে আর কতোদিন মনে রাখতে পারে? কিন্তু চার পাশে তাকিয়ে মানুষের মন যে বদলে যায়। বিদেশে কী পরিবর্তন তার হয়েছে! সে যেন অন্য মানুষ

হয়ে গেছে। তাই আজ তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। দিনে দিনে বয়স বাড়ে কিন্তু দেশ ছেড়ে না বেরিয়ে পড়লে মন বাড়ে না। কথাটা দেরিতে বুঝলো চৌধুরী। তাই থেকে থেকে মালতীর জন্যে আজ সে কাঁদে।

টেমস্-এর উপর দাঁড়িয়ে এতো কথা ভাবতে পারছে চৌধুরী, কিন্তু এ নদীর নাম যদি টেমস্ না হয়ে কড়লা হতো আর শহরের নাম যদি লণ্ডন না হয়ে জলপাইগুড়ি হতো তাহলে এত কথা ভেবে এমনি করে বোধ হয় চৌধুরীকে অশান্তিতে জ্বলতে হতো না। নিজের দেশে যে সংস্কার তাকে নিষ্ঠুর করে তুলেছিলো, আজ বিদেশে তার কথা ভাবলে তার বুকে ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। তাই চৌধুরী ভুললো শুধু তার অন্ধ সংস্কারকে আর যাকে ভুলবো বলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো সে-ই তাকে পেয়ে বসলো।

কিন্তু কেউ জানে না এ কাহিনী। এ হলো চৌধুরীর একান্ত আপনার কথা। তার দেশের লোক জানে মালতী ডুবে মরেছে। কেন ? সে সম্বন্ধে তারা নানা কথা বলে। আর তার জন্যেই তো ঘরছাড়া দেশছাড়া চৌধুরী।

স্টীমারের বাঁশির শব্দে ধ্যান ভাঙলো চৌধুরীর। সত্যি সে লণ্ডনের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে টেমস্ নদী দেখছে। বিগ-বেনে বেজেছে ঠিক সাড়ে তিনটে। ঝিরঝির করে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধরতে পারে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে স্ট্র্যাণ্ডে এসে সে পনেরো নম্বর বাস ধরলো।

চৌধুরী বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। লণ্ডনের প্রকৃতির মেজাজ বোঝে কার সাধ্য ? কখন কী

মূর্তি ধরে বোঝা কঠিন। দরজা খুলে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলো সে।

সেই মারামারির পর রাস্তায় চলবার উপায় নেই চৌধুরীর এ পাড়ায়। ভারতীয় বলে প্রত্যেকটি লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না তাকে। চৌধুরী অবশ্য তাকায় না কারুর দিকে, কাজ সেরেই কোনো রকমে বাড়ি পালিয়ে আসে। কাজ না থাকলে রাস্তায় বার হয় না সে, বেড়াতেও ইচ্ছে করে না তার আজকাল। যা কিছু দেখবার সব দেখা হয়ে গেছে। আর তার বড়ো ভয় পাছে দেশের চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়ে, কেননা তার সঙ্গে তখন অনেকেই জাহাজে চাকরি নেবার চেষ্টা করেছিলো। তাদের কানে যদি সেকথা যায় তাহলে লজ্জায় মরে যাবে চৌধুরী। বিলেতে বসে অতীতের কথা নিজেরই যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তার। কেমন মানুষ ছিলো সে তখন! মানুষ বলে নাকি তাকে!

কোনো কাজ নাই বলে সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর। তাই ইচ্ছে না থাকলেও বাইরে যেতেই হয় তাকে। র‍্যাশন আনা, বাজার করা, লণ্ড্রিতে কাপড় দেয়া নেয়া—এসব তাকেই করতে হয়! এদের দেখা পেয়ে খুশী হয়েছে চৌধুরী। প্রত্যেককেই তার ভালো লাগে। যদি এদের দেখা না পেতো তাহলে হয়তো এতোদিনে মাথা খারাপ হয়ে যেতো তার। জাহাজের কাজ সে করতে পারলো না বেশিদিন। কেবলই মনে হতো, এ-কাজ ব্রাহ্মণের নয়—অস্বস্তি বোধ হতো। তাই জাহাজ ছেড়ে পালালো একদিন চৌধুরী। সেই জাহাজে গণেশও ছিলো, আর গণেশের বন্ধু রতন। গণেশ চৌধুরীকে নিয়ে এলো এখানে। তারপর থেকে নিশ্চিন্ত হলো সে।

লণ্ডনে মাত্র একটি মেয়েকে চেনে চৌধুরী। তার নাম এলসী। সে সপ্তাহে একদিন এসে এদের এই নোংরা বাড়ি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে। ঘণ্টা দুয়েক থাকে সে। মাইনে নেয় সপ্তাহে পাঁচ শিলিং। তার সঙ্গেই শুধু ভাব চৌধুরীর। জলপাইগুড়িতে ফণীন্দ্র দেব স্কুলে পড়েছিলো সে দু-বছর। কিন্তু সে-দু-বছরের ইংরেজী বিদ্যে নিয়ে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে দু-ঘণ্টা গল্প করা একটু কঠিন বইকি! তবু ওরা অনেকক্ষণ কথা বলে।

আজও বাড়ি ফিরে চৌধুরী দেখলো ছেঁড়া কার্পেট সরিয়ে লম্বা ঝাঁটা নিয়ে এলসী ঘর পরিষ্কার করছে। কিন্তু এতো ময়লা জমেছে যে চোখে জল এসে গেছে তার। আস্তে আস্তে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো চৌধুরী।

গুড ইভিনিং এলসী।

গুড আফটারনুন, চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে এলসী হাসলো। এ ঘর পরিষ্কার করে লাভ কি বলো, ওরা ফিরে এসে একদিনে আবার ময়লা করে দেবে।

খুব স্বাভাবিক, ব্যাচেলাররা অমনি হয়।

তাই নাকি? বিয়ে করো না কেন তোমরা? না, বউ আছে তোমাদের দেশে?

আমার কেউ নেই এলসী।

বেচারী। তা, এখানে বিয়ে করবে, না দেশে গিয়ে?

দেশে আর ফিরবো না আমি।

এদেশের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তোমার তাহলে, খিলখিল করে হেসে বললো এলসী।

কিন্তু আমাকে কারুর পছন্দ হয় না যে।

বড়ো বিনয় তোমার।

এলসীর কাছে এসে তার একটা হাত ধরে চৌধুরী বললো, আমাদের দেশে অনেকদিন আগে শুধু একটি মেয়ের আমাকে পছন্দ হয়েছিলো—

তোমাকে ব্যথা দিয়েছে বুঝি? তাতে আর কী হয়েছে? অমন কতো মেয়ে পাবে তুমি! একটা বন্ধু খুঁজে নাও এখানে, তাহলেই তোমার দেশের মেয়েকে ভুলে যাবে তুমি।

চৌধুরী বললো, সে ঠিক তোমার মতো দেখতে ছিলো এলসী—

দূর, রাগ করে এলসী হাত ছাড়িয়ে নিলো, যা-তা বোলো না, তোমাদের দেশের মেয়েরা তো কালো হয়।

না না, জিব কেটে বললো চৌধুরী, রঙের কথা বলি নি আমি। তার চেহারা ছিলো তোমার মতো। তাই তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে হয়। চৌধুরীর কথা বলার ধরনে অন্য ইঙ্গিত মনে করে এলসী বললো, বাট নো হোপ পুওর ম্যান। আমি যে এখন এনগেজ্‌ড। এই দেখ না আংটি। আর কয়েক মাস পরে জিমের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

আহা হা, লজ্জা পেয়ে চৌধুরী বললো, সে কথা বলি নি আমি।

হেসে বললো এলসী, লজ্জা পেও না। বলো তো মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে বাইরে বেরুতে পারি আমি। তবে শনিবার রবিবার হবে না কিন্তু। জিমের সঙ্গে থাকি আমি ও দু-দিন। আবার এলসীর হাত ধরে বললো চৌধুরী, তোমাকে কোনোদিন বাইরে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। সেকথা তো বলি নি আমি। শুধু বলছিলাম, তোমাকে দেখলেই আমার আর-একজনের কথা মনে পড়ে, তার নাম মালতী—

নিচে গোলমাল শোনা গেলো। চৌধুরী বুঝতে পারলো ওরা সগৌরবে ফিরে এসেছে। এলসীর হাত ছেড়ে তাড়াতাড়ি ও ঘরের বাইরে এলো। কিন্তু দীনবন্ধু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সে-ঘরে।

কি হে বিটলে? এলসীর দিকে তাকিয়ে চৌধুরীকে বললো দীনবন্ধু, আছো বেশ! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তেরো বচ্ছর আছি লণ্ডনে, তোমার মতো অমন সাধু ঘুঘু কতো দেখেছি—

আরে থামো থামো। কি রে রতনা কী হলো, খুলে বল ছাই, বিপদ-আপদ হবে নাকি কোনো?

কিন্তু রতন উত্তর দিলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপদ আবার কি? নাচের ভঙ্গী করে হেবো বললো, খাতির কতো! নবাবের মতন খাতিরে রাখলো আমাদের—

লণ্ডনের শ্রীঘর হালার শ্বশুরবাড়ি যে, ফের যামু আমি—

তাই যা না ব্লাড়ি, চেঁচিয়ে উঠলো দীনবন্ধু, শান্তি দে আমাদের। খাই-খরচার পয়সা লাগবে না তোর আর—

গণেশ এতোক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলো। এবার এগিয়ে এসে সকলকে লক্ষ্য করে বললো, মাইণ্ড নেভার এগেন। ফাইট ইংলিচ ম্যান, আই নট লাইক—

উঃ ইংরেজের ওপর বড়ো পিরীত যে, তোর শ্বশুর ইংরেজ—

মে বি চারটেনলি ফাদার-ইন-ল—

তবে যা না ফাদার-ইন-ল'র বাড়ি, এখানে পড়ে থেকে হাড় জ্বালাচ্ছিস কেন আমাদের?

চারটেনলি গোয়িং, ওয়েট পিউ ডেজ হালার পো হালা—

থাম থাম, অবতার!

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় তাহলে। কোর্টে কয়েক পাউণ্ড ফাইন দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দীনবন্ধু সাবধান করে দিলো প্রত্যেককে, যেন এমন কাজ এরা কেউ আর কখনও না করে। নেশা করে মাতাল হওয়া আর অন্যকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলা এদেশের রীতি নয় একেবারে। ইণ্ডিয়া হাউসের সেই বাবুও আজ ওদের বুঝিয়েছে, ইণ্ডিয়ানদের তুর্নাম ওরা আর কখনও না করে, তাহলে এদেশে শুধু অসুবিধাই বাড়বে আর কিছু হবে না। কিন্তু ওরা এতো গোলমাল করছে যে ঠিক বোঝা গেলো না দীনবন্ধুর কথার একবর্ণও ওদের কানে গেছে কি না।

মালপত্র গুছিয়ে রতনকে আড়ালে ডেকে এক সময় বললো বিষ্টু যাই রে রতন এবার। মনটা বড়ো খারাপ, ভালো লাগে না তোদের লণ্ডনে আর—

এতো তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি? থেকে যাও আর তু-একটা দিন।

না রে, বউটার জন্যে বড়ো মন কাঁদে।

শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নাই বিষ্টুদা। যে গেছে সে তো আর কিছুতেই ফিরে আসবে না।

যাবে কোথায় রে আমার বউ? সে তো লিভারপুলে আছে।

লিভারপুলে? রতন বুঝতে পারলো না বিষ্টু কী বলছে।

একটা ঢোক গিলে বললো বিষ্টু, বিয়া আমি আবার একটা করছি বটে রতনা—

কাকে? কবে আবার তুমি বিয়ে করলে বিষ্টুদা?

ইস্রায়েলেরে চিনিস? আমাদের খিদিরপুরের লোক। তার শালীরে।

অবাক হয়ে রতন বললো, বলো কি?

সুন্দর মেয়ে, একটু লজ্জা পেয়ে বিষ্টু বললো, লিভারপুলেই বাড়ি তার—

কিন্তু কই আমরা তো শুনি নাই কিছু—

তোরা লণ্ডনে থেকে জানিস না কিছু অথচ তাজ্জব ব্যাপার দেখ খিদিরপুরে খবর ঠিক পৌঁছালো—

সেই রাত্তিরেই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বিষ্টু চলে গেলো তার ইংরেজ বউয়ের কাছে লিভারপুলে।

৬

এ বাড়ি ছেড়ে শিগগিরই উঠে যাবে গণেশ। এমনভাবে একপাল ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মতো থাকলে চলবে না তার। মেম বিয়ে করে স্বাধীন ভাবে তাকে সাহেবের মতো থাকতে হবে।

এতোদিন এদের সঙ্গে ছিলো কারণ খরচ কম এখানে। অন্য কোথাও গেলে চালাতে পারতো না। কিন্তু এখন সে আরও বেশি খরচ করতে পারে। আর্চওয়েতে ফলের দোকান খুব ভালোই চলছে তার। অনেক ইংরেজ খদ্দের আসে আজকাল। প্রথম প্রথম আসতো না কিন্তু তারা, কালো লোকের দোকান থেকে জিনিস কিনতে চাইতো না সহজে। তাই ব্যবসা গুছিয়ে আনতে বেশ সময় লেগেছিলো গণেশের! বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো তার মুখের দিকে। সাহস করে কেউ কেউ এগিয়ে এসে বলতো, ব্ল্যাকি—ব্ল্যাকম্যান্। কিন্তু গণেশ রাগতো না। হেসে সেই সব ছেলেমেয়েদের আদর করে ফল খেতে দিতো, দাম নিতো না এক পয়সাও। হয়তো বাড়ি গিয়ে তাদের মা-বাপের কাছে বলতো তারা সেকথা। তাই বোধহয় আরম্ভ হলো গণেশের দোকানে ইংরেজ খদ্দেরের ভিড়, আর ফেঁপে উঠলো তার ফলের ব্যবসা। মাঝে মাঝে দেশ থেকে আমও আনায় গণেশ। আমের নামে ইংরেজের জিব দিয়ে জল পড়ে। আরও ভিড় বাড়ে দোকানে। পাড়ার লোকে গণেশের দোকানের নাম দিয়েছে, ব্ল্যাকম্যান্স্ শপ। এতো সাহেব খদ্দের পেয়ে ভারি খুশি আজকাল গণেশ।

সবই তো হলো কিন্তু শুধু বিয়ে করবার মতো মেয়ে পায় নি গণেশ এতোদিন। এখন অবশ্য ইচ্ছে করলেই সে বিয়ে করে ফেলতে পারে। একরকম ঠিক হয়ে গেছে সব।

দোকানের কাছাকাছি থাকে সে মেয়ে। নিয়মিত খদ্দের। নাম ডাফনী। বাবার নাম জন মার্টিন, বাসে কণ্ডাক্টারের কাজ করে। রোজ ভোর ছটারও আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে অনেক রাত্তিরে। ডাফনী কোথায় সে-খোঁজ করে না সে, বিছানায় পড়ে নাক ডাকায়। আরও বেশি দেরিতে বাড়িতে ফেরে মিসেস মার্টিন। টিউব ট্রেনে চাকরি তার। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সে দেখে মেয়ে বাড়ি ফিরেছে কিনা। না ফিরলে ঘাবড়ায় না মোটেই, বরং খুশী হয়। ভাবে, হয়তো ডাফনীকে এখনও ছাড়ে নি তার ছেলে বন্ধু! বড়ো আনন্দে সময় কাটাচ্ছে তারা। তাড়াতাড়ি একটা মনের মতো বর খুঁজে পেলে নিশ্চিন্ত হয় সে। কিন্তু মেয়েটা শুধু বন্ধুই বদলায়, বন্ধুকে বর করে নেবার কোনো উৎসাহই নেই তার। তা করবেই বা না কেন যৌবন উপভোগ, বয়স ওর কতোই বা, মনে মনে ভাবে মিসেস মার্টিন। পাঁচ-দশটা বন্ধু যাচাই করে বিয়ে করা উচিত বৈকি। ডাফনীর মতো বয়সে সে নিজেও তো অমন কতো ছোকরার সঙ্গে ঘুরেছে। দেখতে মন্দ নয় তার মেয়ে, ঠিক লোককে সে বরাবরের জন্যে জুটিয়ে নেবে নিশ্চয়ই।

একদিন ডাফনী বললো, এবার একটা বিয়ে করবো মামি।

যাঃ, সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ মামি, প্রেমে পড়ে গেছি।

কার সঙ্গে রে?

বলো তো কার সঙ্গে?

মাইকেল ?

না না মামি, একটা ইণ্ডিয়ান—

ইণ্ডিয়ান ? বলিস কি রে ? আবার ইণ্ডিয়ান জোটালি কোত্থেকে ? তুই মা পরপর জোটাসও বটে। তা এ ছোঁড়া কে ?

ওই যে যার ফলের দোকান—

ওমা সেই ছোঁড়া, তা ও যে কুচকুচে কালো রে—

তাতে কী হয়েছে ? রাগের ভান করে ডাফনী বললো, অনেক পয়সা ওর।

পয়সা ? বলছিস ? তবে ঠিক আছে! তবু দেখিস বাপু, ওরা একসঙ্গে অনেক বিয়ে করে শুনেছি।

না না, ও এখনও একটাও বিয়ে করে নি।

খোঁজ নিস ভালো করে মা। আর তোর বাপ এ বিয়ের কথা শুনলে কী বলবে কে জানে! ইণ্ডিয়ান-টিয়ানের সঙ্গে আবার ঘুরঘুর আরম্ভ করলি কেন মা ? দেশে কি ছেলে নেই আর ?

গম্ভীর হয়ে ডাফনী বললো, আমি গণেশকে ভালোবাসি। ও ইংরেজ বাঁদরগুলোর চেয়ে অনেক ভালো!

তবে কর মা যা ভালো বুঝিস, বয়স হয়েছে তোর ভালোমন্দ বোঝবার, আমি আর কী বলবো!

আলাপ করবে তুমি ?

বেশ তো।

আসতে বলবো একদিন চায়ে তাহলে ?

দাঁড়া তোর বাপকে বলে দেখি আগে, ইণ্ডিয়ান বাড়িতে ঢুকবে শুনলে সে খেপে না যায়—

তারপর ডাফনীর কাছ থেকে মিসেস মার্টিন শুনলো গণেশের

আগাগোড়া কাহিনী। রাত্তির বেলা বাপ সমস্ত শুনে বললো, লাকি গার্ল, হাতি চড়ে ঘুরে বেড়াবে। তবে সে তো বাঘের দেশ, বাঘে খেয়ে ফেলবে না তো ডাফনীকে ?

না। ইণ্ডিয়ায় যাবে না ওরা কখনও, ছোঁড়া এখানেই ব্যবসা করবে।

তবে আর ভাবনা কি, হাই তুলে পাশ ফিরলো জন মার্টিন।

ডাফনী বলছিলো ওকে একদিন চা খেতে বলবে—

নিশ্চয়ই, এই উইক-এণ্ডেই আসতে বলো, আমিও বাড়িতে থাকবো এ শনিবার।

আচ্ছা বেশ।

স্বামী-স্ত্রী নাক ডাকতে আরম্ভ করলো। ডাফনী কিন্তু তখনও বাড়ি ফেরে নি। হয়তো কোথাও গণেশের সঙ্গে সেই মাঝ রাত্তিরে যৌবন উপভোগ করছে।

শনিবারে ডাফনীদের বাড়ি চা খেতে এলো গণেশ। বার্টন থেকে ন-মাসে করানো নতুন ব্রাউন স্যুট পরেছে সে। গলায় তার উল-ওয়ার্থের সবুজ টাই। ঝকঝক করছে জুতো। ইংরেজ বৈকি গণেশ, পুরো সাহেব হয়ে গেছে সে।

লণ্ডন কাউনটি কাউন্সিলের তৈরি করা বিরাট বাড়ি। অনেক দরিদ্র পরিবার বাস করে সেখানে। তিনটে করে ঘর পেয়েছে এক-একটা পরিবার। বাড়ির পেছনে প্রকাণ্ড পাকা উঠোন। সেখানে সারাদিন চিৎকার করে খেলা করে এদের ছেলেমেয়েরা। মাঝে মাঝে ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে হেঁকে ওঠে কারুর মা, এই থাম থাম, নয়তো গিয়ে থাপ্পড় মারবো এক-একটাকে—

কে শোনে কার কথা ? ওরা কিন্তু থামে না।

এই হলো সাহেবেদের বাড়ি। পাইপ মুখে দিয়ে এদিক-ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করে ঠিক চারটের সময় কলিং-বেল বাজালো গণেশ। সময়-জ্ঞান তার ইংরেজের মতোই বটে। ডাফনীরা থাকে এক তলাতেই। কিন্তু সেই খেলুড়ে ছেলেরা ঘিরে ধরলো গণেশকে।

হ্যালো ব্ল্যাকি !

হ্যালো ইণ্ডিয়ান !

ফ্রুট প্লিজ, ফ্রুট—একটা ছেলে হাত ঢুকিয়ে দিলো তার পকেটে। এমন সময় দরজা খুললো ডাফনী, এসো গণেশ। এই অসভ্য ছেলেগুলো, বেরো এখান থেকে।

গুড আফটারনুন, হেসে গণেশ বললো।

তাকে নিয়ে লাউঞ্জে এলো ডাফনী। সেখানে বসেছিলো তার মা আর বাবা। তাদের সঙ্গে আলাপ হলো গণেশের।

পকেট থেকে নকল মুক্তোর মালা বের করে মিসেস মার্টিনকে বললো গণেশ, ইওর নেকলেচ মামি।

কী খুশী মামি সেটা পেয়ে, অনেক ধন্যবাদ বাছা।

অ্যাণ্ড ইওর চিগ্রেট কেচ ডাডি—

থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয়, মিস্টার মার্টিন সিগ্রেট কেস হাতে নিয়ে বললো, ভেরি নাইস ইন্‌ডিড।

আর আমার জন্যে কী ?

ডাফনীর দিকে তাকিয়ে বললো গণেশ, নাথিং ফর ইউ বিকজ আই এম ইউর। খুব একটা রসিকতা করেছে মনে করে সে নিজেই জোরে হেসে উঠলো।

বেশ সাজানো ঘর। একটা পিয়ানোও রয়েছে সেখানে। রেডিও বাজছে। মেঝেতে লাল রঙের পুরু কার্পেট পাতা। বুক-সেলফে অনেক মোটা মোটা বই। চেষ্টা করে একটার নাম পড়লো গণেশ, ব্রিটিশ বার্ডস।

রুটি জ্যাম মার্মালেড কেক আর ফিশ-পেইস্ট দিয়ে ওরা চা খেতে লাগলো। ধন্য হয়ে গেল গণেশ। খাঁটি ইংরেজ পরিবারের মধ্যে সে জাঁকিয়ে বসে আছে। আর কারুর ভাগ্যে হবে এ রকম?

গণেশ চলে যাবার পর সেই সন্ধ্যায় ডাফনী মাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখলে মামি?

মিসেস মার্টিন তখন গণেশের দেওয়া নেকলেস গলায় পরে দেখছে তাকে কেমন মানায়। ডাফনীর কথা শুনে বললো, সুন্দর ছেলে। কী ভদ্র! হ্যাঁ রে ডাফনী, নেকলেসটা কেমন মানিয়েছে রে?

চমৎকার। আর তুমি কি বলো ড্যাডি?

সুন্দর ছেলে। তবে বিয়ের ব্যাপারে—

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস মার্টিন বললো, কী, বিয়ের ব্যাপারে কি শুনি?

না মানে, আত্মীয়-স্বজনরা একটু আপত্তি করবে—

করে করুক, তোমার মুখ-পোড়া আত্মীয়-স্বজনরা কি আমাকে এমন নেকলেস দেবে? ডাফনীর ভাগ্য ভালো সে এমন ছেলেকে বন্ধু পেয়েছে।

হেসে ডাফনী বললো, গণেশেরও ভাগ্য ভালো মামি—

আরে রাখ তোর বাজে কথা, বাধা দিয়ে মিসেস মার্টিন বললো, এখন চট করে বিয়েটা করে ফেল দেখি, তোর কপালে তো টেকে না কেউ বেশিদিন।

আমিই টিকি না। কাউকে যে ভালো লাগে না আমার।

এ যাত্রা দয়া করে টিকে থাক মা, এ ছেলেটাকে হাতছাড়া করলে দুঃখ করবি বলে দিলুম।

অমন কতো জুটবে আমার।

থামা তোর বড়ো বড়ো কথা। এমন নেকলেস-দেনেওয়ালা ছেলেদের তোর মতো মেয়ে-বন্ধুর অভাব হয় না, বুঝলি?

হেসে ডাফনী বললো, নেকলেস তো আমাকে দেয় নি, দিয়েছে তোমাকে।

কথায় তোর সঙ্গে আমি পারবো না মা।

একটু কেশে মিঃ মার্টিন বললো, সিগারেট কেসটার কিন্তু অনেক দাম।

ওর যে প্রচুর পয়সা ড্যাডি।

হুঁ? ইণ্ডিয়ানদের পয়সা আছে শুনি। তবে ওদেশে লোক আবার না খেতে পেয়ে মরেও যায়—

আঃ, নেকলেস দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ডাফনীর মা, তোমাকে কতবার বলবো বুড়ো মিন্সে যে ওরা ইণ্ডিয়ায় যাবে না—যাবে না, এখানেই ব্যবসা করবে,—শুনলে কথা?

ও তবে ঠিক আছে, হেসে বললো ডাফনীর বাবা, ফল পাওয়া যাবে ঝুড়ি ঝুড়ি, কি বলিস ডাফনী? আমার শুভ কামনা—মঙ্গল হোক তোর মা!

সেই থেকে গণেশ প্রায়ই যায় ডাফনীদের বাড়ি।

গণেশের ভাবী শ্বশুর আসলে রসিক লোক। আজকাল তাকে দেখলেই ঘোঁত-ঘোঁত করে বাঘের ডাক ডাকে আর মুখের সামনে

হাত বেঁকিয়ে হাতির শুঁড় দেখায়। তার ধারণা ভারতবর্ষের পথে বাঘ আর হাতি ঘুরে বেড়ায়।

ডাক শুনে হবু শাশুড়ী বলে, ও তো শুয়োরের ডাক, বাঘ অমনি ঘোঁত-ঘোঁত করে ডাকে বুঝি ?

শ্বশুর বলে, ডাকে, জিজ্ঞেস করো না গণেশ বাছাকে।

জিজ্ঞেস করবার আগেই গণেশ চটপট করে উত্তর দেয়, ইয়েস মামি, লিটিল টাইগার ডু ঘোঁত-ঘোঁত—

তাই নাকি ? বাঘ তুমি দেখেছো বাছা ?

ও ইয়েস, হেসে বলে গণেশ, ইন জু গার্ডেন, বাট বিগ নট লিটিল—কথা শেষ না করেই সে কি হাসি গণেশের !

একদিন মিঃ মার্টিন জিজ্ঞেস করলো, ওহে বাছা, রোপ-ট্রিক জানো ?

কথাটার মানে না বুঝে গণেশ স্রেফ বলে দিয়েছিলো, ইয়েস।

তারপর একদিন শনিবারে গণেশের প্রাণ যায় আর কি ! বহু লোক জড়ো হয়েছে ডাফনীদের বাড়িতে। তার বাবা সকলকে বলে বেড়িয়েছে, আমার হবু জামাই ইণ্ডিয়ান রোপ-ট্রিক দেখাবে আজ।

গণেশ আসতে না আসতেই এক দড়ি হাতে করে ছুটে এলো মিঃ মাট্রিন, এসো বাছা রোপ-ট্রিক দেখাও—

দড়ি আর অতো লোক দেখে গণেশের তো চক্ষু ছানাবড়া। ফাঁসি দেবে নাকি তাকে আজ এরা !

দড়ি নেড়েচেড়ে সে বললো, হোয়াট হোয়াট ?

কাম অন—রোপ-ট্রিক্—

রোপ-ট্রিক হোয়াট ?

ফেমাস ইণ্ডিয়ান ম্যাজিক—

আই ডোণ্ট নো।

হবু জামাই-এর মুখ দেখে মিসেস মার্টিন মনে করলো অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। স্বামীকে আড়ালে ডেকে তাড়া দিয়ে বললো, বলা নেই কওয়া নেই হুপ করে কেন বেচারিকে লজ্জায় ফেলছো? আর আগে থেকে তৈরি না থাকলে কেউ দেখাতে পারে নাকি ম্যাজিক? কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি তোমার একটুও, মুখপোড়া মিন্সে?

তাই তো, সরি, বলে তখন সরে পড়লো বটে মার্টিন, কিন্তু তারপর থেকে গণেশকে একা পেলেই বলে, কি হে বাছা, কবে দেখাবে বলো রোপ-ট্রিক।

গণেশ উত্তর দেয়, আফটার ম্যারেজ।

আজকাল প্রায়ই হবু শ্বশুর, শাশুড়ী আর ডাফনীকে নিয়ে বেড়াতে বার হয় গণেশ।

মিসেস মার্টিন আপত্তি করে বলে, তোমরা যাও বাছা, আমরা তোমাদের অসুবিধা ঘটাবো শুধু শুধু—

নো নো, গণেশ শাশুড়ীর হাত ধরে বলে, ইউ আর মাই মামি-ডাডি, চারটেনলি ইউ কাম—

আসলে গুষ্টিশুদ্ধ ইংরেজ নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে গর্ব হয় গণেশের। ইণ্ডিয়ানগুলো হাঁ করে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গণেশের মতো এমন সৌভাগ্য কটা লোকের হয়! দুহাতে পয়সা খরচ করে সে ওদের পেছনে। সিনেমা দেখায়, নৌকো বাওয়ায়, দিশি রেস্তোরাঁয় খাওয়ায় আর হাইড পার্কে ঘোড়ায়ও চড়ায় গণেশ মাঝে মাঝে হবু শ্বশুর-শাশুড়ীকে।

বাড়ি ফিরে মিসেস মার্টিন বলে, ওরে ডাফনী সুখে থাকবি তুই।

কী কপাল তোর। আর আমার পোড়া কপালে কিনা জুটলো একটা বুড়ো বাস-কণ্ডাক্টার—

কথা শুনে জোরে জোরে কাশে মিঃ মার্টিন।

কাজেই বিয়েটা একরকম ঠিক গণেশের। কিন্তু একথা কেউ জানে না—রতনও নয়। একটা ইণ্ডিয়ানকেও সে নেমন্তন্ন করবে না। সে যেন কোনো ভারতীয়কে চেনেই না। বিয়ের পর নিশ্চয়ই সে বাংলা ভুলে যাবে। এতোদিন তার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হয় নি শুধু ওই নোংরা ইণ্ডিয়ানগুলোর জন্যে। ওদের সঙ্গে মেশামেশি একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

চুপেচাপে গণেশ ঘর খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথাও না পেয়ে একেবারে অনিচ্ছায় সে শরণ নিলো আলি সাহেবের।

আলি সাহেব বাইশ বছর আছে লণ্ডনে। বছর কয়েক হলো একটা গোটা বাড়ি কিনেছে অল্ডগেটে। লোক ভালো আলি সাহেব, অবস্থাও ভালো তার। নানারকম ব্যবসা আলি সাহেবের, নকল মণি-মুক্তো, দিশি আতর, আরও নানা জিনিসের। মেম বউ তার, আর একমাত্র ছেলে, নাম টিপু। ইংরেজের মতো ফরসা রঙ টিপুর। বয়স সাত-আট বছর। প্রায়ই বউকে সঙ্গে নিয়ে আলি সাহেব লণ্ডন-মস্কে নমাজ পড়তে যায়।

তাই শুনে দীনবন্ধু মাঝে মাঝে বলে, শালার তিন তিনটে মসজিদ এখানে অথচ কালীবাড়ি নেই একটাও, কতোদিন যে মায়ের চরণামৃত মাথায় ঠেকাই নি। নাঃ, শালার হিঁদুগুলোর আর কিছু হবে না।

রাজ্যসুদ্ধ ইণ্ডিয়ান আলি সাহেবের ছেলের আঙ্কল। রাস্তায় দেখা হলে সবাই ফুটফুটে টিপুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে।

রতন তার নাম দিয়েছে টিপু সুলতান। বেশ সুন্দর ইংরেজী বলতে পারে তো ছেলেটা—তাকে আদর করতে করতে রতন ভাবে মনে মনে।

ওদের সঙ্গে একরকম গায়ে পড়ে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে দিলো গণেশ।

দীনবন্ধু বললো, যা শালা, দেখা যাবে কতো ইংরেজের ঘর-জামাই হোস তুই—

চাট আপ হালার পো হালা!

কিন্তু কিছুদিন পর রতন খবর দিলো, সত্যি মেম বিয়ে করেছে গণেশ, আর আলি সাহেবের বাড়ির ছুটো ঘর ভাড়া নিয়ে বউকে এনেছে সেখানে। আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, কিন্তু চিনতেই পারলো না আমাকে—

চৌধুরী এক সুরে বলে উঠলো, তারা তারা!

দীনবন্ধু বললো, মরুক বেটা। সাধে বলে ভালো করতে হয় না কারুর। এতো করলাম আমরা বেটার জন্যে আর শালা এতো বড়ো হারামজাদা আমাদের খবরও দিলো না একটা—

বিয়েটা তাহলে সত্যি চুকে গেছে গণেশের!

বিষ্টুর বউ-এর নাম ক্ল্যারা। এক রবিবারে বউকে নিয়ে আবার লণ্ডনে এলো বিষ্টু। সঙ্গে এলো তার ভায়রাভাই ইস্রায়েল আর বন্ধু রহমান।

এতোদিন বিষ্টু ছিলো ইস্রায়েলের ফ্ল্যাটে। কিন্তু ছেলেপিলে হবে ইস্রায়েলের বউ-এর। তাই ছুটি নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাচ্ছে, সিলেটে রেখে আসবে বউকে এবার। আর এদিকে বিষ্টুকেও ঘুরতে হবে জাহাজে জাহাজে—আফ্রিকা আমেরিকা সিলোন—কত জায়গায় যাবে সে। কিন্তু ক্ল্যারাকে রাখবে কোথায়? তিন-চার রাত ভাবনায় বিষ্টুর ঘুম হলো না।

বিষ্টুর বউকে দেখবার জন্যে অল্ডগেটের সমস্ত বাড়ি ভেঙে পড়লো রতনের ঘরে।

হেলো হেলো ?

গুড মর্নিং !

কনগ্রাটুলেশন্‌স্—

চৌধুরী শাদা ময়লা পাজামা আর গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আনন্দে সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়ালো ক্ল্যারার সামনে। তার ঘাড় ধরে বললো দীনবন্ধু, বলি কোট-প্যান্ট কিনেছো কি মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে ? হ্যাঁ রে বামুনের ঘরের ভূত—

চৌধুরী জিব কেটে ছুটে গেল ড্রেসিং-গাউন গায়ে চড়াতে। সে ফিরে এলে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো দীনবন্ধু, আদব-কায়দা তোমাকে শেখায় কার বাপের সাধ্যি !

রতন ক্ল্যারার মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলো। আজ বিষ্টুকে তার একটুও ভালো লাগছিলো না—তার বউকেও নয়।

সে ভাবছিলো খিদিরপুরের একটি নির্দোষ বাঙালী মেয়ের কথা। বিষ্টুর কাকার চিঠি পড়ে রতন আজও মনে রেখেছে তার নাম—দুর্গা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ডুরেশাড়ি-পরা সরল একটি বাঙালী মেয়ের ছলোছলো মুখ। অনেক—অনেকদিন আগে মৃত স্বামীর চিতায় নিজেকে ভস্ম করতো হিন্দু মেয়েরা। পুড়ে মরবার সময় দুর্গা কি সেই কথা ভেবেছিলো? গুজবে হয়তো সে বিশ্বাস করে নি। শেষরাত্রের স্বপ্নে পাগলা মহেশ্বর তাদের ঠিক খবর দেয়। প্রবাসী স্বামীর মঙ্গলকামনায় যখন তাদের ঘুম আসে না তখন ভোলা শিব মনের মুকুরে মেলে ধরে স্বামীর প্রতিমূর্তি আর তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাত হাজার মাইল দূরে বসে তাই ক্ল্যারাকে চিনেছিলো দুর্গা। আর বিষ্টুর বিয়ের আগাগোড়া দৃশ্য একদিন শেষরাত্রে নিশ্চয়ই দেখিয়েছিলো তাকে পাগলা মহেশ্বর। স্বামীর অপমৃত্যু সে সহ্য করতে পারে নি, তাই হাসতে হাসতে চলে গেছে তার মহাবরের কাছে। বাঙালী সতী মেয়ের চোখে ধুলো দেবে কোন স্বামী? লণ্ডনে থেকে রতন জানে না কিছু, অথচ দুর্গার কানে পৌঁছালো সব কথা! কার সাধ্য তাকে অসুখী করে? এতো মনের জোর আর কার? তাই তো বার বার রতন স্বপ্ন দেখে তার সোনা বউ-এর। তার বউ হবে সতী, হবে তার সুখদুঃখের সঙ্গিনী, জানবে একমাত্র তাকেই। তার কথা ভাবলেই শিহরণ লাগে রতনের।

বিয়া আমি করতে চাই না রতনা, তুই বিশ্বাস কর।

আমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছি তোমাকে ?

তবে অমন রাগ-রাগ মুখ কেন তোর ?

অমনি।

তুই দেখ ক্ল্যারারে, অমন ভালো মেয়ে হয় না।

নিজের বউ-এর কথা সবাই অমনি ভাবে।

তুই দেখ না, ভালো করে পরিচয় কর।

চাই না আমি পরিচয় করতে।

তুই ওকথা বললে কে দেখাশুনা করবে আমার পরিবারের ?

তার মানে ?

আমি তো জাহাজে যাবো, কখন কোথায় থাকি ঠিক নাই। তাই বউকে রেখে যাবো তোদের কাছে—

এই বাড়িতে ?

হ্যাঁ রে রতন।

বাড়ি আমার একার নয়, আর এই বাড়িতে মেয়েদের থাকার অসুবিধা অনেক।

আমার বউ কোনো অসুবিধা গেরাহ্যি করে না রে রতনা। দীনবন্ধুর আপত্তি নাই কোনো, চৌধুরীও রাজি, শুধু তুই—

সকলের মত থাকলে আমি না বলবার কে ?

তোদের কতো সুবিধা হবে দেখিস। সংসারের কাজে ক্ল্যারায় জুড়ি মেলা ভার। বিয়া কি আমি শুধু শুধু করলাম রে ?

অতো কথা না বললেও চলবে বিষ্টুদা, ওসব কথায় দরকার নাই আমার। সকলের মত থাকলে আমারও অমত নাই।

বিষ্টু বউ রেখে চলে গেলো। সঙ্গে গেলো ইস্রায়েল আর রহমান। রতন তার ঘর ছেড়ে দিলো ক্ল্যারাকে। নিজে এলো

চৌধুরীর ঘরে।

তারা তারা, বললো চৌধুরী, মেয়ে না থাকলে কি বাড়ির শ্রী খোলে!

থাম থাম, দীনবন্ধু তার তীক্ষ্ণ গলায় বলে গেলো, লণ্ডনে বসেও ছিরি খোলবার সাধ বিটলের—

তারা তারা, হেসে বললো চৌধুরী।

বিষ্টু যে কদিন ছিলো সে কদিন খুব পোলাও-মাংস খেয়েছে এরা। ইস্রায়েল আর রহমান রান্না করেছে। পেশোয়ারী আতপ এনেছিলো ওরা দশ সের।

আজও চৌধুরী ঢেকুর তোলে আর বলে, আবার কবে আসবে ওরা? জাহাজে চাকরি করার সুখ অনেক, ভালো চালের ভাবনা ভাবতে হয় না মোটে—

হ্যাঁ রে হ্যাংলা বামুন, হাঁকে দীনবন্ধু, হাজার বার বলেছি হেউ হেউ করে বিলেতে ঢেকুর তুলবি না, তা স্বভাব যাবে কোথায় বিটলের?

চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে, পারডেন।

পার্ডেন, দাঁত খিঁচোয় দীনবন্ধু। বাড়িতে বিষ্টুর ইংরেজ বউ, একটু আদব-কায়দা মেনে চলবি, তা না হলে ও ভাববে ইণ্ডিয়ানগুলো তোর মতো জংলী ভূত—বুঝলি?

চৌধুরী ঘাড় নেড়ে জানালো যে সে বুঝেছে।

দীনবন্ধুর কথা শুনে মনে মনে হাসে রতন। তার সব সময় ভয়, পাছে ইণ্ডিয়ানদের নাম খারাপ হয় এখানে। যেন, আবার হাসে রতন, ইণ্ডিয়ানদের লণ্ডনে কতোই নাম!

বিষ্টু চলে যাবার দিনকয়েকের মধ্যে অনেককেই যেতে হলো। মুন্দ বেঙ্কো হেবো শিবে আবার জুটলো জাহাজের ডাকে সাড়া দিতে। ওদের খালি ঘরে রতন আসবো আসবো করছে, এমন সময় একদিন বললো দীনবন্ধু, একটা মুশকিল হয়েছে রে—

কী মুশকিল ?

বেচারার উপকার না করলেই নয়।

কার উপকার ?

আরে সেই কথাটা বলবার জন্যেই তো আমি বসে আছি তোর জন্যে রাত্তির জেগে।

কী কথা বলো, রতন ভয়ে ভয়ে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। আবার সে মোটা টাকা ধার না চেয়ে বসে।

ভদ্দরলোকের ছেলে বড়ো বিপদে পড়েছে রে, ইণ্ডিয়া হাউসে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। বাপ সন্দেহ করে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। অথচ ভদ্দরলোকের ছেলে তো, জেদ ষোলো আনা। বলে, ছ মাস পর আমার পরীক্ষা, এখন কী করি আমি ?

তা কী করতে বলো আমায় ? টাকা চাই নাকি কিছু ?

না না, টাকা সে চায় না। ভদ্দরলোকের ছেলে, হাত পেতে টাকা কি নিতে পারে আমাদের কাছে ?

তবে আর কী করতে পারি আমরা ?

একটু চুপ করে থেকে দীনবন্ধু বললো, আমি তাকে কথা দিয়েছি এই বাড়িতে এসে থাকবে সে। পয়সা নেবো না আমরা একটাও। ভদ্দরলোকের ছেলের একটা উপকার করতে পারলে পুন্যি হবে রে রতনা, পাপ তো করেছি কতো তার ঠিক নাই।

এই বাড়িতে ? ভদ্দরলোকের ছেলে ? তোমার কি মাথা খারাপ

হয়েছে দীনুদা ? এ বাড়িতে থাকতে পারে কখনও সে ?

মাথা চুলকে বললো দীনবন্ধু, আমি সব খুলে বলেছি তাকে, আপত্তি নাই তার কোনো। আর বাড়িতে জায়গাও তো আছে এখন রতনা। ভদ্দরলোকের ছেলে—বড়ো মায়া লাগলো কিনা আমার।

রতন আর কিছু বললো না। সে চুপ করে ভাবছিলো, মায়া-দয়া তাহলে আছে দীনবন্ধুর।

ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র চাপিয়ে এসে উঠলো একদিন বঙ্কিম। ক্ল্যারা তার ঘর গুছিয়ে ঝকঝকে করে রেখেছে। সঙ্গে এনেছে বঙ্কিম রাশি রাশি বই। এরা তাকে কেমন করে খাতির করবে ভেবে পেলো না।

সকলের সঙ্গে আলাপ হলো বঙ্কিমের। কিন্তু নাম ধরে তাকে ডাকলো না কেউ। দীনবন্ধু তার নাম দিয়েছে, খোকাবাবু।

নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই খোকাবাবুর। খালি বই আর বই। কোনো দিকে তাকায় না সে, মাথা নিচু করে শুধু পড়েই যায়।

খাবার পর যখন খোকাবাবু নিজের বাসন নিজে ধুতে যায় তখনই এদের সঙ্গে লাগে তার মারামারি।

না না না খোকাবাবু—

কেন ? সবাই তো নিজের বাসন নিজে ধোয় এখানে ?

কিন্তু সবাইএর তো আর পরীক্ষা নেই ছ মাস বাদে। তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু পড়ে যাও। পাশ হলে তারপর যা খুশি কোরো তখন।

কিন্তু এটা অন্যায় নয় ?

কিছু অন্যায় নয়, দীনবন্ধু বলে, ভদ্দরলোকের লেখাপড়া-জানা

ছেলে তুমি খোকাবাবু, আহা কতো কষ্ট হচ্ছে তোমার এখানে বলো তো!

এতো সুখে আর থাকবো কোথায়? একটু থেমে খোকাবাবু বলে, ভদ্রলোক বন্ধুরা তো এখন আর চিনতেই পারে না আমাকে।

না পারুক, ড্রেসিং-গাউনের দড়ি নাড়তে নাড়তে চৌধুরী বলে, আমরা থাকতে তোমার কোনো ভাবনা নাই খোকাবাবু।

আপনাদের কাছে আমি যে কী কৃতজ্ঞ, জল এসে পড়ে খোকাবাবুর চোখে।

থাক থাক খোকাবাবু, আগে পাশটা করে নাও দেখি ভালো করে।

খোকাবাবুর একরাশ বইএর দিকে মাঝে মাঝে রতন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, ওর একটা বইও যদি সে পড়তে পারতো!

খোকাবাবু, অতোগুলো বই পড়তে হয় তোমাকে?

হ্যাঁ, হাসে খোকাবাবু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে রতন। লেখাপড়া শেখার সাধ তার অনেক দিনের।

৮

ডাফনীকে বিয়ে করে গণেশ এসে উঠলো আলি সাহেবের বাড়ি। এক তলায় ছুটো বেশ বড়ো বড়ো ঘর, আলাদা বাথরুম আর পাশেই একটা ছোটো রান্নাঘর।

ভাড়া বেশি নিতে চায় না আলি সাহেব। বলে, দেশের ছেলে তুমি, যা হয় ধরে দিও, বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যবসা নয় তো আমার।

তার স্ত্রী বলে, নতুন বিয়ে করেছো তোমরা, আমরা রয়েছি পাশে যখন, যা দরকার বোলো, কোনো সঙ্কোচ কোরো না।

আলি সাহেব যদি মেম বিয়ে না করতো তাহলে গণেশ কিছুতেই উঠতো না এখানে। তবু আলি সাহেবের চারপাশে একটা ইংরেজী গন্ধ আছে। আর টিপুর চেহারা একেবারে সাহেবদের মতো। কিন্তু আলি সাহেব যখন গণেশকে দেশের ছেলে বলে উল্লেখ করে তখন মনে মনে খুবই রেগে যায় সে। ভাবে, একটু পুরোনো হলে আলি সাহেবকে বারণ করে দেবে আর ওকথা বলতে। যাক, আপাতত আলি সাহেবের ফ্ল্যাট পেয়ে খুশি হলো গণেশ।

কিন্তু নাক সিঁটকে ডাফনী বললো, এ মা, এই নোংরা পাড়ায় থাকতে হবে নাকি আমাদের ?

হোপলেস, নো বিল্ডিং নো হোয়ার।

কিন্তু এই জঘন্য ছুটো ঘরে থাকবো কেমন করে ? বন্ধু-বান্ধব বেড়াতে এলে কী ভাববে ?

ভেরি মাচ ট্রাইং, নিউ বিল্ডিং কুইকলি গেটিং—

হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি খোঁজ কর। এখানে বেশিদিন থাকলে মরে যাবো আমি।

প্রথম কয়েকদিন প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাটলো। ফলের দোকান এখন বন্ধ রেখেছে গণেশ। বিয়ের আগে ডাফনী চাকরি করতো কারখানায়, এখন সংসার করবে বলে চাকরি ছেড়েছে। কাজেই সারাদিন তারা শুধু ঘুরে বেড়ায়। আর ভালো ভালো রেস্তোরাঁয় দামী দামী খাওয়া খায়। মেম বিয়ে করে গণেশ ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তাই নতুন ফ্ল্যাট খোঁজবার খেয়াল থাকে না তার, সময়ও হয় না। ডাফনী কেবলই বলে, এ দাও ও দাও তা দাও। টেনিস খেলবো র‍্যাকেট কিনে দাও, স্কেটিং করবো বুট এনে দাও, সাঁতার কাটবো নতুন কস্ট্যুম কিনে দাও—এমনি আরও অনেক ফরমায়েশ। ডাফনীর মন জোগাতে গণেশ দুহাতে টাকা খরচ করতে লাগলো। কিন্তু একদিন বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হলো ডাফনীকে, হেলো ডার্লিং, টু-মরো শপ ওপেনিং—

এতো তাড়াতাড়ি কেন প্রিয়তম? কিছুদিন কি সবুর করা যায় না?

নো নো, মানি নিয়ার্লি অল ফ্লাইড।

কী?

নো মানি—মানি ফ্লাইড, হাত নেড়ে বললো গণেশ, ফ্লাইড। নাও নট শপ ওপেনিং হোয়াট ইটিং?

কী? বেশ অবাক হয়ে ডাফনী জিজ্ঞেস করলো, কত হাজার পাউণ্ড আছে তোমার ব্যাঙ্কে?

নো ব্যাঙ্ক—মাই মানি পোস্টাফিস।

রীতিমতো হতাশ হয়ে ডাফনী বললো, কতো টাকা আছে তোমার পোস্ট অফিসে।

ফোর শিলিংস।

কী! ডাফনী প্রায় চিৎকার করে উঠলো, এই সামান্য টাকা নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে সাহস করেছিলে?

মানি স্লাইড হুস আফটার ম্যারেজ—

চুপ করো! ছি ছি এখন কী করবো আমি!

ঘাবড়ে গিয়ে গণেশ বললো, নট এংরি ডার্লিং। শপ ওপেনিং, প্রফিট ছেলিং, মানি কামিং কুইকলি।

তুমি বদমাইস, তুমি জোচ্চোর, তুমি ঠকিয়েছো আমাকে—

নো নো, আই নট—

চুপ করো, চুপ করো। আমার বন্ধু মাইকেলকে আমি নেমন্তন্ন করেছি শনিবারে, আমরা সবাই মিলে থিয়েটারে যাবো—এখন কী হবে?

ডাফনীকে শান্ত করবার জন্যে গণেশ তাড়াতাড়ি বললো, মিঃ আলি মেনি মানি, আই টেক সাম ফ্রম হিজ—

যা খুশি করো তোমার, আমি জানি না কিছু। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে ডাফনীর।

আলি সাহেবের কাছ থেকে সত্যি টাকা ধার করলো গণেশ। তারপর টাল সামলে আবার দোকান খুললো। এবার চৈতন্য হলো তার। কিন্তু তাতে ফল হলো না বিশেষ। ডাফনী ভাবলো গণেশ মিথ্যা কথা বলেছে তাকে। আসলে তার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে। তাই স্বামীকে অবিশ্বাস করে সে ঘন ঘন নেমন্তন্ন করতে লাগলো বন্ধু মাইকেলকে।

ইণ্ডিয়ানদের একেবারেই পছন্দ করে না মাইকেল। তাই যখন গণেশ বাড়িতে থাকে না তখন সময় করে আসে। ডাফনীর ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারে না আজও! গণেশ সঙ্গে থাকলে ডাফনীকে নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না মাইকেল। কালো লোকের সঙ্গে রাস্তায় চলতে তার লজ্জা হয়। মাঝে মাঝে গণেশকে বাদ দিয়ে ডাফনীকে নিয়ে বেড়াতে বার হয় সে। ডাফনী গণেশকে বুঝিয়েছে ইংরেজ স্বামীরা এতে কিছু মনে করে না। আর গণেশও বুঝেছে তাই, সেও কিছু মনে করে না।

ডাফনী আরও বুঝিয়েছে যে মাইকেল গণেশের সঙ্গে বেশি কথা বলে না আর তার সামনে বেশি আসতে চায় না, কারণ গণেশের ভাষা বুঝতে পারে না সে।

একথা শুনে বেশ একটু দুঃখিত হয়ে গণেশ বললো, বাট ইউ আণ্ডারচ্টেন্ মি ?

আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।

আই টক গুড ইংলিচ ?

নিশ্চয়ই, দিন দিন উন্নতি হচ্ছে তোমার।

এবার খুব খুশি হয়ে গণেশ বললো, আই ইংলিচ—

যখন গণেশ বাড়ি ফিরে দেখে যে ডাফনী নেই, হয়তো মাইকেলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, তখন মাঝে মাঝে আলি সাহেবের ফ্ল্যাটে যায় সে। আলি সাহেব আর তার স্ত্রী বুঝতে পেরেছে যে ডাফনী তাদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ পছন্দ করে না, তাই আস্তে আস্তে তারা দূরে সরে গেছে। তবু গণেশ টাকা চাইলেই হাসিমুখে তাকে টাকা ধার দেয় আলি সাহেব, আর তার স্ত্রী বলে, যখন যা দরকার বোলো, আমার স্বামীর দেশের ছেলে তুমি। ওই

'দেশের ছেলে' শুনেই 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে গণেশ।

বাইরে কোনো খাওয়াই খায় না আলি সাহেব—তার স্ত্রীও নয়। সমস্ত খাওয়া বাড়িতে তৈরি করে তার স্ত্রী। লাঞ্চের সময় স্বামীর কাজ থাকলে সঙ্গে লাঞ্চ দিয়ে দেয়। টিপুকে তার মা নিজে পড়ায় আর সাজিয়েগুছিয়ে ইস্কুলে পাঠায় রোজ। সিলেট থেকে শাড়ি আনিয়েছে আলি সাহেব। বেশির ভাগ সময় সেগুলো পরে তার স্ত্রী। গণেশ এদের সংসার করা দেখে আর ভাবে, ডাফনী এমন করলে এতো পয়সার ভাবনা হতো না তার।

পয়সার টানাটানির জন্যে একদিন বাধ্য হয়ে গণেশ বললো ডাফনীকে, হোয়াই নট কুক হোম ডেলি? ভেরি চিপ। আউট ইটিং অল মানি গোয়িং—

মুখ নাড়া দিয়ে ডাফনী বললো, এই নোংরা ঘরে আমি রান্না করতে পারবো না।

বাট আলিজ ব্রাইড কুক—সী নাইস ম্যান।

ও তো জিপসী, ওরা সব পারে।

'জিপসী' কথাটার মানে জানে না গণেশ। ভাবলো ওটা একটা ভালো বিশেষণ, তাই বললো, ইউ জিপসী।

কী? আমি শাড়ি পরি ওর মতন? ঘেন্না করে আমার ইণ্ডিয়ানদের পোশাক দেখলে।

ডাফনীর আরও কাছে এগিয়ে এসে গণেশ বললো, বাট মাই ড্রেস মারকৈলাস, আই ইংলিচ।

একদিন টিপু সুলতানকে দেখতে পেয়ে গণেশ বললো, হেলো টিপু কামিং মাই রুম?

আন্টি মেরেছে আমাকে, তোমাদের বাড়ি যেতে বারণ করে দিয়েছে।

গণেশ বাড়ি ঢুকতেই ডাফনী বললো যে টিপুকে যেন বেশি লাই না দেয় সে। ছেলেমেয়ে ভালো লাগে না তার।

বাট হি লিটিল সান—

চুপ করো তুমি।

চুপ করতেই হলো গণেশকে। ওদিকে মাইকেল আসে নিয়মিত। উচ্ছ্বসিত হয়ে তার সম্বন্ধে নানা গল্প বলে ডাফনী গণেশকে। বড়ো ভালো ছেলে মাইকেল। যুদ্ধে গিয়ে খুব নাম করেছিলো। আর একটু হলেই লেফটেনেণ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু ঠিক তার আগেই যুদ্ধটা গেলো থেমে। মাইকেলের সঙ্গে বড়ো একটা দেখা হয় না গণেশের। দোকান নিয়ে বড়ো ব্যস্ত সে এখন। তাড়াতাড়ি কিছু পয়সা করতে না পারলে মান থাকবে না ডাফনীর কাছে।

অএল ডার্লিং, দোকানে বেরোবার আগে একদিন গণেশ বললো, কাম মাই শপ। অল ডে এলোন। মাইণ্ড ক্রাই ফর ইউ।

সময় কোথায় প্রিয়তম? হেসে বললো ডাফনী, মাইকেল আর মাত্র দু সপ্তাহ থাকবে লণ্ডনে, রোজ সে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

একটু গম্ভীর হয়ে গণেশ বললো, বাট আচবেণ্ড নট হোম ম্যান কামিং এট ওয়াইফ, নট নাইস—

কথা শুনে ডাফনী গেলো খেপে, কী, অপমান করছো তুমি আমাকে? এ কি তোমার ইণ্ডিয়া নাকি?

গণেশ তাড়াতাড়ি বললো, নো নো আই নট ইনচাণ্ট ইউ—

সে খুব লজ্জা পেলো মনে মনে। ছি ছি, এমন করে ডাফনীকে বলা তার মোটেই উচিত হয় নি। সত্যি এটা তো.ভারতবর্ষ নয়। ঠিকই বলেছে ডাফনী। আর গণেশ তো এখন খাঁটি ইংরেজ। তাই তার স্ত্রীর ছেলেবন্ধু এলে অমন কথা বলা তার সাজে না। এদেশে কোন স্ত্রীর নেই ছেলেবন্ধু ? এখানকার স্ত্রীরা কি ঘোমটা টেনে আড়ালে থাকে নাকি ? গণেশ প্রতিজ্ঞা করলো মনে মনে যে এমন ভুল সে আর কখনও করবে না। কিন্তু খুব শিগগিরই প্রতিজ্ঞা উঠলো মাথায় তার। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তার শরীর খারাপ হওয়ায় দোকান বন্ধ করে সে চলে এলো বাড়ি। কিন্তু ঘরে ঢুকেই প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলো সে, তারপর রাগে মাথা থেকে পা অবধি কাঁপতে লাগলো তার। সে দেখলো সোফায় পাশাপাশি বসে আছে ডাফনী আর মাইকেল। চোখ তাদের বোজা আর এক হাত দিয়ে ডাফনী বেশ শক্ত করে গলা জড়িয়েছে মাইকেলের। তারা দুজনেই একেবারে তন্ময়। গণেশ যে এসে দাঁড়িয়েছে সে-ঘরে সেকথা তারা কেউ বুঝতেই পারলো না।

চিৎকার করে উঠলো গণেশ, হোয়াট দিস ?

চমকে উঠলো দুজন। গণেশকে দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাইকেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো ডাফনী, চেঁচাচ্ছো কেন তুমি ?

আচবেণ্ড নট হোম ইউ টাচিং ম্যানস নেক ?

ও আমার বন্ধু, জানো না তুমি সেকথা ?

দিস নট ফ্রেণ্ড, ইউ লাইক আচবেণ্ড-ব্রাইড—

ব্যাপার দেখে মাইকেল বললো, আমি আসি ডাফনী।

না, বোসো তুমি। দেখি আনকালচার্ড কালার্ড লোকটা কী করে।

ডিভোর্স করবো আমি ওকে। একরকম জোর করেই মাইকেলের হাত টেনে আবার সোফায় বসালো ডাফনী, তারপর যেমন বসেছিলো তেমনি করে আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরলো।

চোখ লাল হয়ে গেছে গণেশের। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

মাইকেলের সামনে এসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভাঙা গলায় সে বললো, গেট আউট হালার পো হালা—

চুপ করো, চেঁচিয়ে উঠলো ডাফনী।

এইবার এক আশ্চর্য কাণ্ড করলো গণেশ। বললো, লুক, আই চিটাগং-সান ফিনিচ ইউ টু বাই নাইফ—বলেই ধাঁ করে দেরাজ থেকে বের করলো ছোরা।

চট্টগ্রাম-সন্তানের দাপট দেখে যুদ্ধ-ফেরত ইংরেজ-নন্দন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি—আমি যাই ডাফনী—

আর ইণ্ডিয়ানের হাতে ছোরা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো ডাফনী। ছুটে এলো আলি সাহেব আর তার স্ত্রী।

কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?

গণেশের হাতে ছোরা দেখিয়ে দিয়ে মুর্ছিতের মতো শুয়ে পড়লো ডাফনী।

গণেশ বললো, আই আউট এণ্ড দে টাচ নেক—

আরে ছি ছি, লম্বা-চওড়া আলি সাহেব বেঁটে গণেশের কাছে থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, এরকম কেউ করে এখানে? পুলিশের হাঙ্গামে পড়বে যে—

ডোণ্ট কেয়ার, সিন ব্রিক্সটন জেল।

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। মাইকেল তুমি আমাকে নিয়ে চলো এখুনি—

কিন্তু কোথায় মাইকেল! সুযোগ পেয়ে কখন সে সরে পড়েছে কে জানে!

ডাফনী কিন্তু একাই চলে গেলো একটু পরে। যাবার সময় বলে গেলো গণেশকে, অমার্জিত ইণ্ডিয়ানকে এই অপমানের জন্যে উচিত শিক্ষা দেবে সে।

দাঁত কড়মড় করে বলে উঠলো গণেশ, আই চিটাগং-সান, ইউ টাচ মাই রুমস উড এগেন, ফিনিচ ইউ বাই নাইফ—

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে তখন রাস্তায়।

আরে ছি ছি ভাই, গণেশকে শান্ত করে বললো আলি সাহেব, বিয়েটা একটু দেখে-শুনে করতে হয় তো! কতো রকম মেয়ে আছে এই লণ্ডন শহরে!

তার স্ত্রী বললো, ইংরেজ মেয়ে যে এরকম অভদ্র হয় তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

গণেশ তখন আলি সাহেবের হাতে সেই ছোরাটার দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা লক্ষ্য করে হেসে বললো আলি সাহেব, ছোরা আর পাচ্ছো না তুমি ভাই, এটা নিয়ে চললাম আমি। নইলে যা মাথা গরম তোমার, কোনদিন হয়তো মেরে দেবে আমাকেই। হাঃ হাঃ হাঃ।

গণেশের ব্যাপারের বিস্তৃত খবর যথাসময়ে গিয়ে পৌছলো অল্ডগেটের সেই বাড়িতে। একটা হাসাহাসির ধুম পড়ে গেলো সেখানে।

ঠিক জব্দ হয়েছে বেটা, দীনবন্ধু বললো, শালার শ্বশুর

সাহেব। বেটার দেমাক কতো! মর এবার সাহেব শ্বশুরের বাড়ি গিয়ে তুই—

রতন একবার গিয়েছিলো আলি সাহেবের বাড়ি। কিন্তু গণেশের কোনো খবর দিতে পারলো না সে। সেই ব্যাপারের ছ'দিন পর সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে বলতে পারে না আলি সাহেব। আর একদিন কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে রতন গিয়েছিলো গণেশের দোকানে। কিন্তু এখন একজন ইংরেজ কিনে নিয়েছে তার দোকান। সেও কোনো খবর দিতে পারলো না গণেশের।

কিন্তু কিছুদিন পর ইণ্ডিয়া হাউসের সামনে দিয়ে গটগট করে গণেশকে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে ধরলো তাকে দীনবন্ধু, কি রে বেটা, মেম বিয়ে করার শখ মিটেছে তো?

হোয়াট? একটুও লজ্জা না পেয়ে গণেশ বললো, আই ইংলিচ, নট নেটিব লাইক ইউ। ওয়াইফ কাম ওয়াইফ গো ফাইট ডিভোর্স, ভেরি নেচারেল দিস কানট্রি।

উঃ, বেটা ভাঙবে তবু মচকাবে না।

আই মেরি এগেন বাট কেয়ারপুল দিস টাইম। লুকিং লুকিং টু থ্রি দেন মেরি আই ইংলিচ—

থাম থাম—

চাট আপ হালার পো হালা চাইলেন্ট—

তারপর আর কেউ দেখতে পায় নি গণেশকে লণ্ডনে। সে আবার বিয়ে করলো কিনা, কিংবা এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে কোথায় গেলো, কেউ জানে না সে-খবর।

৯

অসুবিধা হয় শুধু চৌধুরীর। সব দিক থেকেই তার বড়ো মুশকিল এখন। গরম পড়েছে হঠাৎ লণ্ডনে। ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম-সূর্যের মতো তেজ এখন লণ্ডনে-সূর্যের। আজ আট-দশ দিন ধরে উত্তাপ নিরানব্বুই ডিগ্রি। কী খুশী এদেশের লোক! প্রত্যেকের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। ক্ল্যারা দিনের মধ্যে হাজার বার হাসিমুখে বলে, কী সুন্দর দিন! কতোদিন যে এমন দেখি নি আমি।

হাসা উচিত বলেই হয়তো হাসে চৌধুরী আর সায় দেয় ক্ল্যারার কথায়। কিন্তু আসলে প্রাণ বেরিয়ে যায় তার। এদেশে গরম একেবারেই সহ্য করতে পারে না চৌধুরী, শুধু হাঁসফাঁস করে সে। তবু যখন ক্ল্যারা বাড়িতে ছিলো না, তখন এতো কষ্ট হতো না তার। খালি গায়ে খালি পায়ে শুধু একটা পায়জামা পরে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতো সে, আর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মাঝে মাঝে বলে উঠতো তারা, তারা! এখন ক্ল্যারা রয়েছে এখানে, তাই এই গরমেও গরম ড্রেসিং-গাউন পরে ঘরে বসে থাকতে হয় তাকে। হয়তো শুধু প্যাণ্ট-শার্ট পরতে পারলে কষ্ট কিছু কম হতো তার। কিন্তু সেদিক থেকেও হয়েছে বিপদ। ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে তার কাপড়-চোপড়। প্যাণ্ট পরে ওভারকোট কিংবা ড্রেসিং-গাউন না পরলে ছেঁড়া ঢাকা পড়ে না। তাই গরমে সারাদিন শুধু হাঁসফাঁস করে চৌধুরী আর অভ্যাসমতো সেই একসুরে থেকে থেকে বলে যায়, তারা তারা! ওদিকে আর একটা মুশকিল হয়েছিলো তার।

আর একটু হলেই ক্ল্যারা এলসীকে ছাড়িয়ে দিতো। খুব কায়দা করে এক রকম জোর করেই তার চাকরি বজায় রেখেছে চৌধুরী।

এলসীর সঙ্গে আজকাল আরও বেশি আলাপ হয়েছে তার। মালতীর সঙ্গে তার অনেক মিল। তাই তাকে দেখলে সান্ত্বনা পায় চৌধুরী, আর তার মনে পড়ে মালতীর কথা— কড়লার ক্ষুব্ধ তরঙ্গে অকালে হারিয়ে-যাওয়া বউ তার। কতোই বা এলসীর বয়স কে জানে! হয়তো সতেরো কিংবা কুড়ি। মালতী যখন চলে যায় তখন তার বয়স কতো ছিলো? কতো বছর আগেকার কথা সে? সব ঠিক স্মরণে আসে না চৌধুরীর। তবু মনে হয় অনেক কথা। ব্রাহ্মণ চৌধুরী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে জন্মান্তরে। আর এলসীকে যতোবারই দেখে ততোবারই তার সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মনে হয় এ যেন তারই সেই মালতী, অন্যরূপে আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু আজ তো সে তেমন করে ধরা দেবে না। যাকে একদিন অন্ধ সংস্কারের তাড়নায় গৃহহারা করেছিলো চৌধুরী, আজ তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাধনা করতে হবে তাকে —আগেকার দিনের মুনি-ঋষিদের মতো। আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই তার। তারা তারা! ভগবানে মনপ্রাণ সঁপে দেয় চৌধুরী। কতোই ছলনা জানে তার দেবতা! কতো সমুদ্র ঘুরিয়ে তিনি বাড়ালেন তার জ্ঞান, দূর করলেন সংস্কার, তারপর আবার নতুন রূপে এনে দিলেন মালতীকে তার সামনে। তবু তার ভগবান তাকে কঠিন পরীক্ষা করে দেখবেন যে মনে মনে সে একেবারে সংস্কার-মুক্ত কি না, মুনি-ঋষিদের বংশধর আসল ব্রাহ্মণ কিনা সে। আজ যদি আবার মালতীকে ঘরে ফিরিয়ে না নেয় সে, তাহলে নরকেও গতি হবে না তার। তাই যে-স্ত্রীর হাত একদিন অন্যলোক শুধু স্পর্শ

করেছিলো এই সামান্য অপরাধে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলো। চৌধুরী, আজ সেই একই মানুষ তাকে এসে বলেছে, আমার সঙ্গে বিয়ে হবে অন্যলোকের, তবু গ্রাহ্য করছে না কিছু চৌধুরী। কী কঠিন পরীক্ষা করছে কঠোর ভগবান! চৌধুরী হাসে মনে মনে, সে জানে জয় তার হবেই। এ বিধির বিধান। ভুল হবার উপায় নেই। অধৈর্য হয়ে সে শুধু বলে ওঠে, তারা! তোমার লীলা কে বুঝবে মা!

এলসীকে ছাড়িয়ে দিতে চাইলো ক্ল্যারা। বললো, শুধু শুধু এখন সপ্তাহে পাঁচ শিলিং খরচ করবার কী দরকার? মেডের কোনো দরকার নেই, আমি একাই সব করে নিতে পারবো।

কথা শুনে আশঙ্কায় শিউরে উঠলো চৌধুরী। সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখতে পায় সে এলসীকে। সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে বাঁচবে কেমন করে! চাকরি চলে গেলে এলসী বোধ-হয় আর আসবে না এখানে।

না না, তা কখনোই হয় না ক্ল্যারা।

কেন রে বিটলে? উঃ দরদ কতো! বলি পয়সা দেবার নাম নেই একটাও, আর খরচ বাঁচাতে গেলে—

আমি দেবো এলসীর পাঁচ শিলিং সপ্তাহে।

এবেলা তোমার পয়সা আসে কোত্থেকে? সন্ন্যাসী-ঘুঘু, ডুবে ডুবে জল খাও তুমি।

আঃ, করুণ স্বরে বললো চৌধুরী, দয়া-মায়া নেই তোমাদের একটুও? সকাল থেকে রাত্তির অবধি খাটে বিষ্টুর বউ। বিষ্টু নাই এখানে, নিশ্বাস ফেলবার সময় দেও না ওরে, এই কি বন্ধুর কাজ নাকি?

আর একটু হলেই ক্ল্যারা এলসীকে ছাড়িয়ে দিতো। খুব কায়দা করে এক রকম জোর করেই তার চাকরি বজায় রেখেছে চৌধুরী।

এলসীর সঙ্গে আজকাল আরও বেশি আলাপ হয়েছে তার। মালতীর সঙ্গে তার অনেক মিল। তাই তাকে দেখলে সান্ত্বনা পায় চৌধুরী, আর তার মনে পড়ে মালতীর কথা— কড়লার ক্ষুব্ধ তরঙ্গে অকালে হারিয়ে-যাওয়া বউ তার। কতোই বা এলসীর বয়স কে জানে! হয়তো সতেরো কিংবা কুড়ি। মালতী যখন চলে যায় তখন তার বয়স কতো ছিলো? কতো বছর আগেকার কথা সে? সব ঠিক স্মরণে আসে না চৌধুরীর। তবু মনে হয় অনেক কথা। ব্রাহ্মণ চৌধুরী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে জন্মান্তরে। আর এলসীকে যতোবারই দেখে ততোবারই তার সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মনে হয় এ যেন তারই সেই মালতী, অন্যরূপে আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু আজ তো সে তেমন করে ধরা দেবে না। যাকে একদিন অন্ধ সংস্কারের তাড়নায় গৃহহারা করেছিলো চৌধুরী, আজ তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাধনা করতে হবে তাকে —আগেকার দিনের মুনি-ঋষিদের মতো। আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই তার। তারা তারা! ভগবানে মনপ্রাণ সঁপে দেয় চৌধুরী। কতোই ছলনা জানে তার দেবতা! কতো সমুদ্র ঘুরিয়ে তিনি বাড়ালেন তার জ্ঞান, দূর করলেন সংস্কার, তারপর আবার নতুন রূপে এনে দিলেন মালতীকে তার সামনে। তবু তার ভগবান তাকে কঠিন পরীক্ষা করে দেখবেন যে মনে মনে সে একেবারে সংস্কার-মুক্ত কি না, মুনি-ঋষিদের বংশধর আসল ব্রাহ্মণ কিনা সে। আজ যদি আবার মালতীকে ঘরে ফিরিয়ে না নেয় সে, তাহলে নরকেও গতি হবে না তার। তাই যে-স্ত্রীর হাত একদিন অন্যলোক শুধু স্পর্শ

করেছিলো এই সামান্য অপরাধে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলো চৌধুরী, আজ সেই একই মানুষ তাকে এসে বলেছে, আমার সঙ্গে বিয়ে হবে অন্যলোকের, তবু গ্রাহ্য করছে না কিছু চৌধুরী। কী কঠিন পরীক্ষা করছে কঠোর ভগবান! চৌধুরী হাসে মনে মনে, সে জানে জয় তার হবেই। এ বিধির বিধান। ভুল হবার উপায় নেই। অধৈর্য হয়ে সে শুধু বলে ওঠে, তারা! তোমার লীলা কে বুঝবে মা!

এলসীকে ছাড়িয়ে দিতে চাইলো ক্ল্যারা। বললো, শুধু শুধু এখন সপ্তাহে পাঁচ শিলিং খরচ করবার কী দরকার? মেডের কোনো দরকার নেই, আমি একাই সব করে নিতে পারবো।

কথা শুনে আশঙ্কায় শিউরে উঠলো চৌধুরী। সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখতে পায় সে এলসীকে। সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে বাঁচবে কেমন করে! চাকরি চলে গেলে এলসী বোধ-হয় আর আসবে না এখানে।

না না, তা কখনোই হয় না ক্ল্যারা।

কেন রে বিটলে? উঃ দরদ কতো! বলি পয়সা দেবার নাম নেই একটাও, আর খরচ বাঁচাতে গেলে—

আমি দেবো এলসীর পাঁচ শিলিং সপ্তাহে।

এবেলা তোমার পয়সা আসে কোত্থেকে? সন্ন্যাসী-ঘুঘু, ডুবে ডুবে জল খাও তুমি।

আঃ, করুণ স্বরে বললো চৌধুরী, দয়া-মায়া নেই তোমাদের একটুও? সকাল থেকে রাত্তির অবধি খাটে বিষ্টুর বউ। বিষ্টু নাই এখানে, নিশ্বাস ফেলবার সময় দেও না ওরে, এই কি বন্ধুর কাজ নাকি?

ঠিক বলেছিস বিটলে। বুদ্ধি আছে বটে তোর একটু। তারপর দীনবন্ধুই জোর করে রাখলো এলসীকে।

সত্যি আশ্চর্য মেয়ে ক্ল্যারা। খুব অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বাড়ির চেহারা ফিরিয়ে দিলো সে। কাজ করে বেশি, কথা বলে কম। ছেলেদের করতে দেয় না ঘরের কোনো কাজ। হাসিমুখে একা একা সমস্ত কাজ করে যায়। তার ওপর খোকাবাবুর ঘরে যথাসময়ে পৌঁছে দেয় চা কিংবা কফি।

আর মাঝে মাঝে বলে, খোকাবাবু একটু বাইরে বেরোও, এতো পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে ?

হেসে উড়িয়ে দেয় বঙ্কিম, সময় নেই। পরীক্ষা এসে গেলো যে। তোমাদের বড়ো অসুবিধায় ফেলেছি, না ?

কী যে বলো ! খোকাবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ল্যারা বলে, তোমার বাবা তোমার মতো ছেলেকেও অবিশ্বাস করে ! কেমন দেশ তোমাদের ?

একথায় জ্বলে ওঠে বঙ্কিম, তাই তো পাশ করে বাবাকে দেখাতে চাই আমি। জানো ক্ল্যারা, আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা যে তোমাদের দেশে এলেই মানুষ নাকি খারাপ হয়ে যায়, মায়াবিনীর দেশ এটা।

তাই নাকি ? কিন্তু তোমাকে তো চেনেন তোমার বাবা।

তবু সেকেলে লোক। কে কি লিখে দিয়েছে তাই বিশ্বাস করে বসে আছেন।

কী আশ্চর্য ! বঙ্কিমকে আর বিরক্ত না করে সরে যায় ক্ল্যারা। সে মনে মনে ভাবে হয়তো খুব বেশি ভুল করে না খোকাবাবুর বাবা। ছেলে দূরদেশে থাকলে সব বাপেরই ভাবনা হওয়া

স্বাভাবিক। অন্তত বিষ্টুর বউ তো পুড়ে মরবার সময় তাই ভেবে ছিলো, মায়াবিনীর দেশ এটা। কিন্তু সত্যি ক্ল্যারা জানতো না সে কথা। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে তার স্বামীর আর-একটা বউ আছে দেশে। জানলে কিছুতেই সে বিষ্টুকে বিয়ে করতো না। কিন্তু বিষ্টু তাকে বলে নি সেকথা একবারও। কেন বলে নি? স্ত্রীকে কি ভারতীয়রা এমনি করেই প্রতারণা করে? আর কোনো উপায় নেই এখন। বিষ্টুকে ভালোবেসেছে ক্ল্যারা। তাই তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তবু অনেকবার তার স্বামীকে একথা জিজ্ঞাসা করেছে সে।

তোমার দেশের বিয়ের কথা আমাকে বলো নি কেন?

হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, উত্তর দিতে পারে নি বিষ্টু।

তুমি আমাকে এমনি করে ঠকালে কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার দেশের বউকে ভালোবাসি না।

কিন্তু আমাকে সে কথা আগে বলো নি কেন?

আমাকে তাহলে তুমি বিয়ে করতে না—

কিন্তু আমি যদি এখন তোমাকে ছেড়ে যাই?

আমি মরে যাবো ক্ল্যারা।

স্বামীর কথা শুনে অজানা ভয়ে ক্ল্যারার গা ছমছম করে। তাড়াতাড়ি বিষ্টুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, না না আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না—

বিষ্টু এখন তার স্বামী সেকথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না ক্ল্যারা। সে এখন কাছে নেই, তাই সব সময় ক্ল্যারা সংসার নিয়ে মেতে থাকে। ভুলে যেতে চেষ্টা করে স্বামীর অতীত—মুছে দিতে

চায় যতো গ্লানি। কিন্তু রতন! আশ্চর্য মানুষ বলে তাকে মনে হয় ক্ল্যারার। যদিও দেখা বেশি হয় না তার সঙ্গে, কিন্তু যখন হয় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকে রতন। ক্ল্যারা বুঝতে পারে তাকে শুধু এড়াতে চায় সে। বোধহয় বিষ্টুর স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্যে দায়ী করে তাকে। ক্ল্যারা জানে বিষ্টুর বিশেষ বন্ধু রতন। আর বিষ্টু তাকে বলেছে যে রতন তাদের বিয়েতে খুশি হয় নি মোটেও, আবার বিয়ে করেছে বলে অসন্তুষ্ট হয়েছে তার ওপর। কিন্তু তার কি দোষ ক্ল্যারা ভেবে পায় না কিছু। তার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই কোথায় যেন একটা মিল আছে। যে নির্দোষ তাকেই শুধু শাস্তি দিতে চায় লোকে। রতনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ক্ল্যারা। কিন্তু কেমন করে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পেলো না! তবু এক রাত্তিরে জেগে বসে রইলো সে রতনের জন্যে। তারপর রতন এলে বললো, আমার ঘরে একটু আসবে?

অবাক হয়ে রতন বললো, কেন?

তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবো।

এতো রাত্তিরে? আমি বড়ো ক্লান্ত ক্ল্যারা।

আমিও। চা খাবে রটন্?

না। ধন্যবাদ।

এসো আমার ঘরে—বোসো।

এ বাড়িতে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ক্ল্যারা?

খিলখিল করে হেসে ক্ল্যারা বললো, না। আর হলেও তাতে তোমার কিছু যায় আসে কি?

রতন উত্তর দিলো না। একটু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে বসে

রইলো। ক্ল্যারার ঘরের জানালা খোলা। গ্রীষ্মের হাওয়ায় উড়ছে তার সোনালি চুল। রতন হঠাৎ ভয় পেলো। সে আশঙ্কা করলো মহাসর্বনাশের। বার বার সে শুধু মনে করতে লাগলো ক্ল্যারা তার বন্ধুর বউ।

ক্ল্যারা, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে না? কেউ দেখলে কী ভাববে?

যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু এই রাত্তিরে মেয়ের ঘরে—

আমি মেয়ে নই, তোমার বন্ধুর বউ, মহিলা।

আশ্বস্ত হয়ে রতন বললো, আমাকে মাপ করো ক্ল্যারা। বলো, কী বলতে চাও তুমি?

তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?

কেন বলবো না?

আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করো না।

আরে ছি ছি, একি বলছো তুমি! আমার যে সময় নেই একেবারে—

ও তোমার মিথ্যা কথা। আমি জানি বিষ্টুর বউ-এর পুড়ে মরবার জন্যে তুমি দায়ী করো আমাকে।

ঘাবড়ে গিয়ে রতন বললো, না না—

কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি জানতাম না সে কথা। বিষ্টু আমাকে একবারও বলে নি যে তার বিয়ে হয়েছে। একথা জানলে আমি কখনো বিয়ে করতাম না তাকে।

কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছো কেন ক্ল্যারা?

কারণ আমি চাই আমার ওপর কোনো রাগ রাখবে না কেউ।

আমার রাগ নেই তো তোমার ওপর।

কিন্তু আমার স্বামীর ওপর তো আছে।

বিষ্টু বলেছে তোমায় সেকথা?

হ্যাঁ।

কিন্তু তাতে কী যায়-আসে তোমার ক্ল্যারা?

যথেষ্ট যায়-আসে। সে আমার স্বামী। আমার স্বামীর ওপর কাউকে কোনো রাগ রাখতে আমি কিছুতেই দেবো না।

কিন্তু তার দেশের লোক? তার আত্মীয়-স্বজন?

তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বিষ্টুর হয়ে ক্ষমা চাইবো আমি।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো রতন, আমাদের দেশে যাবে তুমি?

আমার স্বামীর দেশে নিশ্চয়ই যাবো। সকলকে গিয়ে বোঝাবো, ছেলে-বেলায় বিয়ে হয়েছিলো বিষ্টুর, ভালোবেসে সে বিয়ে করে নি, বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিয়েছিলো তার। তাই আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে কোনো অন্যায়ই সে করে নি। ওর দিশি বউ-এর মৃত্যুর জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। কেন সে ভালোবাসলো না অন্য কাউকে? কেন সে আবার বিয়ে করলো না? সে বোকা তাই পুড়ে মরলো—একথা আমি তোমাদের দেশে গিয়ে বলবো প্রত্যেককে।

ক্ল্যারার কথা শুনে রতন হাসলো মনে মনে। ভাবলো, ইংরেজ মেয়ে ক্ল্যারা, কেমন করে সে বুঝবে যে সতী-লক্ষ্মী বাঙালী মেয়ে এক স্বামী ছাড়া কথায় কথায় ভালোবাসতে পারে না অন্য কাউকে। তাই স্বামী ভালো না বাসলেও অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা

কল্পনাও করতে পারে না তারা। জ্বলে-পুড়ে সেই বিয়ে-করা এক স্বামীকে সুখী করবার জন্যে দরকার হলে হাসতে হাসতে প্রাণও দিতে পারে।

খোকাবাবু তখনো একসুরে পড়ে যাচ্ছে জোরে জোরে। তার কথার একবর্ণ বুঝতে না পারলেও স্পষ্ট ওদের কানে এলো তার গলার স্বর।

সেই থেকে রতনের আর কোনো রাগ নেই ক্ল্যারার ওপর, আর বিষ্টুকেও সে ক্ষমা করে ফেললো মনে মনে। তবু মাঝে মাঝে তার শুধু মনে পড়ে একটি বাঙালী মেয়ের দগ্ধ শরীর। সেই পোড়া দেহটাকে কি আবার পুড়িয়েছিলো তার আত্মীয়-স্বজন? যতো ভাবে পরের কথা আর কখনও ভাববে না, তবু অনেক সময় পরের ভাবনায় ঘুম হয় না রতনের।

গ্রীষ্মকালে রতনের বড়ো বেশি মনে পড়ে দেশের কথা। সকালে হোটেলে আসবার সময় টিউবে বসে সে ভাবে যে এটা যেন ভারতবর্ষের রেলগাড়ি। বম্বে থেকে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। গোয়ালন্দ থেকে স্টীমার ধরে সে যাবে চাঁদপুর। তারপর সেখান থেকে সটান নোয়াখালি। টিউব ট্রেন হয়ে দাঁড়ায় নোয়াখালির সেই গাড়ি। আর ঘড়ি দেখে মনে মনে সময় হিসেব করে। এখন দেশে বেজেছে বেলা সাড়ে বারোটা। কী করছে সোনাবউ। নিশ্চয়ই রান্নাঘরে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে বাতাস খাচ্ছে হাতপাখা নিয়ে। কী রান্না করেছে আজ সে? ডাল পুঁইশাক আর আলুর চচ্চড়ি। দূরে কোকিল ডাকছে। করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে ভোলা বৈরাগী। পেয়ারা গাছে উড়ে এসে এইমাত্র বসলো

ছুটো বুলবুলি। শালিখের দল জটলা করছে উঠোনে। কুঁড়েঘরের চালে কাক সমানে ডেকে চলেছে কা কা কা—

মাইণ্ড দি ডোরস্! হেঁকে ওঠে টিউবের গার্ড। চমকে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখে রতন টেম্পল স্টেশন। এর পরের স্টেশনে বদলাতে হবে তার ট্রেন।

এক-একবার মনে হয় রতনের এই মুহূর্তে চলে যায় দেশে। আর ভালো লাগে না তার এখানে। সেই রঙমাখা মেয়ে আর কাঠের পুতুলের মতো ফিটফাট ছেলের দল! সেই পায়ে পা লাগলে 'সরি' আর কথায় যন্ত্রের মতো 'থ্যাঙ্ক ইউ', ওজন করে আস্তে আস্তে কথা বলা আর মেপে মেপে সাবধানে চলা-ফেরা আর একদিনও ভালো লাগে না তার। তবু তাকে যেতে হয় ইণ্ডিয়া গ্রীলে, তেমনি করেই ছুটাছুটি করতে হয়। ভুপালের সঙ্গে রেস্তোরাঁর আলোচনা আরা আইলীনের সঙ্গে রসিকতা করেই দিন কেটে যায় তার। না, আর নয়, এবার থেকে অন্তত পাঁচ শিলিং করেও সে জমাবার চেষ্টা করবে রোজ। তাহলে তার দেশে ফেরবার ভাড়ার টাকা উঠে যাবে।

মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে হয়ে যখন বড়ো বেশি মন খারাপ হয় তখন কাজে মন দিয়ে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে রতন।

গম্ভীর হয়ে ভুপালকে বলে, কিছু খেয়াল আছে নাকি আপনার মল্লিক সাহেব? ওদিকে পিকাডিলিতে আর এক বাঙালীবাবু দোকান খুলেছে যে। আমাদের থেকে দাম কিছু কম সেখানে। লোকে সেখানেই যাচ্ছে সব আজকাল। দেখতে পান না আপনার দোকানে কতো ভিড় কমে গেছে—

তা তুই বল রতন কী করি আমি? আমার দোকানের সব

ভার তো তোদেরই ওপর ছেড়ে দিয়েছি। নে না, দাম বদলে নতুন মেনু তৈরি কর—যা ইচ্ছে হয় কর তুই—

ব্যস্ত হয়ে মেনু নিয়ে নতুন দাম বসায় রতন। আইলীন তার কাছে এসে বলে, বড়ো সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছো তুমি রটন। রতন হাসে, কথার উত্তর দেয় না।

ভূপাল ডাকে আইলীনকে, এখন বিরক্ত কোরো না ওকে আইলীন, দোকান উঠে যাবে তাহলে, পাশেই নতুন দোকান হয়েছে যে, দাম সেখানে অনেক কম।

রতনকে বিশ্বাস করে ভূপাল।

সেপ্টেম্বর মাসে মাস কয়েকের জন্যে দেশে যাচ্ছে ভূপাল। ঠিক পূজোর সময় গিয়ে পৌঁছতে চায়। টমাস্ কুকে প্যাসেজ বুক করেছে সে। জিনিসপত্র এখন থেকেই কেনা-কাটা আরম্ভ করেছে কিছু কিছু।

তুমিও যাচ্ছো নাকি আইলীন? রতন জিজ্ঞেস করলো।

কোথায়?

জানো না, ভূপাল দেশে যাচ্ছে? তুমি যাবে নাকি ওর সঙ্গে?

না, আমি যাচ্ছি না। ও তো যাচ্ছে মোটে কয়েক মাসের জন্যে, তারপর আবার চলে আসবে এখানে, আর যাবে না। আমরা দুজন এখানে একসঙ্গে থাকবো।

আর আমি?

তুমি? আইলীন বললো, তোমাকে আমি ক্যাশিয়ার করে নেবো আমাদের,—খুশি?

খুব।

ভূপালের যাওয়ার উদ্যোগ দেখে মন খারাপ হয়ে যায়

রঞ্জনের। বলে আমাকেও নিয়ে চলো মল্লিক সাহেব, ফিরে এসে চাকরি করে ধার শোধ করে দেবো তোমার।

দূর পাগল, তুই গেলে আমার দোকান চালাবে কে? তুই আর আইলীন তো ভরসা। আইলীন একা পারে কখনও।

মাঝে মাঝে ভূপালকে ভারি ভালো লাগে রঞ্জনের।

এলসী তাহলে শেষ অবধি থেকেই গেলো। শুধু দিন গোনে চৌধুরী—আর কতোদিন আমাকে এ কঠোর পরীক্ষায় রাখবে মা—কতোদিন আর এমনি করে কঠিন শাস্তি দেবে। আমরা কে, সব তোমারই ইচ্ছা, তারা তারা!

আজকাল এলসীর সঙ্গে নির্জনে কথা বলা একেবারেই হয়ে ওঠে না চৌধুরীর। বড়ো কঠিন কর্ত্রী ক্ল্যারা। সে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে নেয় এলসীকে দিয়ে। এটা পরিষ্কার করো, ওটা সরাও, সেটা আরও ভালো করে পালিশ করো—এমনি আরও অনেক ফরমায়েশ। বেচারীর মুখ দেখে দুঃখে বুক ভেঙে যায় চৌধুরীর। সে ছুটে এসে যথাসম্ভব সাহায্য করে তাকে। ক্ল্যারাকে বলে, আহা ও ছোটো মেয়ে, অতো পরিশ্রম করতে পারে কখনও। ক্ল্যারা কী ভাবে কে জানে, সে কিছুক্ষণের জন্যে সরে যায়। আর তখুনি কথা বলবার সুযোগ পায় চৌধুরী। বাড়িতে আর কেউ নেই। শুধু ঘরের দরজা বন্ধ করে খোকাবাবু পড়ে যাচ্ছে এক মনে।

চৌধুরী এলসীর কাছে এগিয়ে এসে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। তারপর ডাকে, মালতী!

ফিক করে হেসে এলসী বলে, ওর মানে কি?

সেই আমার দেশের মেয়ে যে আমাকে ভালোবাসতো, তার নাম মালতী। তুমিই তো সেই মেয়ে মালতী—

আবার হেসে এলসী বললো, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।

আমি জানি, বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় চৌধুরীর।

ক্ল্যারা কে? ওকে আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমার বউ বুঝি?

দূর, ও আমার বন্ধুর বউ। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার বউ হতে পারে কখনও?

সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

চৌধুরী তার হাত ধরে বলে, তুমি আমার বউ।

এলসী ঝাঁটা তুলে নিয়ে চৌধুরীকে চুমু খেয়ে বলে, প্রিয়তম!

তারা তারা, আর কতোদিন এ পরীক্ষায় রাখবে মা!

আকুল আগ্রহে শুধু দিন গোনে চৌধুরী। কবে তাকে এলসী এসে বলবে, তুমি আমার স্বামী, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো গো!

যদি এই জন্মান্তরের কথা, মালতীর সঙ্গে মিলের সমস্ত কাহিনী চৌধুরী এলসীকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারতো তাহলে হয়তো তাকে ফিরিয়ে আনা একটু সহজ হতো, তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শেষ হতো তার। কিন্তু অতো কথা গুছিয়ে বলবার মতো ইংরেজী বিদ্যা চৌধুরীর নেই।

তবু সে জিজ্ঞেস করে, এলসী, টেমস নদী দেখেছো তুমি?

ওমা লণ্ডনে থেকে টেমস দেখবো না?

মনে মনে কথা সাজিয়ে একটু ভেবে বলে চৌধুরী, আচ্ছা তোমার কি কখনও মনে হয় না যে অন্য কোনো দেশ থেকে ওই টেমস নদীতে ভেসে এ দেশে এসেছো তুমি?

অবাক হয়ে এলসী বলে, এই দেখো! সব পুরুষই যে একরকম কথা বলে! আমার ফিঁয়াসে জিমও ঠিক অমন কথা বলে গো!

সে আমার হাত চেপে ধরে বলে চলো ওই নদীতে ভেসে আমরা অন্য কোনো দেশে চলে যাই—

তারা তারা, তাড়াতাড়ি এলসীর হাত ধরে বলে ওঠে চৌধুরী, আর কতো কঠিন শাস্তি দেবে মা।

বর্ষা নামলো হঠাৎ লণ্ডনে। সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি। কখনও ঘণ্টা কয়েকের জন্যে থামে, মুখ বাড়ায় ম্লান সূর্য, তারপর আবার যে কে সেই। কদিন থেকে বাজও পড়ছে ঘন ঘন। এমনি এক সজল দিনে চৌধুরীর কাছে ফিরে এলো মালতী। পরীক্ষা শেষ হলো তার, ধরা দিলো এলসী। কাগজে বেরিয়েছে টেমস নদীতে জোয়ারের জোর আজ খুব বেশি। কড়লা যাকে হরণ করেছিলো টেমস তাকে ফিরিয়ে দিলো।

সেই ম্লান অপরাহ্ণে দুহাত বাড়িয়ে এলসীকে কাছে টেনে নিয়ে বললো চৌধুরী, আমি জানতাম আমার কাছে তুমি একদিন আসবেই—

কিন্তু জিম এতো বড়ো পাজি দেখো, শেষে গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বলে, তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে চাই না আমি।

তারা তারা, সব তোমারই ইচ্ছা! এলসীকে বললো চৌধুরী, আমি ছাড়া আর কারুর হতে পারো তুমি কখনও!

কিন্তু তার সঙ্গে আমার বিয়ের সমস্ত ঠিক ছিলো যে—

তা থাক তা থাক, শক্তি দাও মা, মনে বল দাও, কিন্তু দেখো ভগবানের লীলা, শেষ অবধি আমি তোমাকে পেলামই। তোমার জন্য কতোদিন পথ চেয়ে বসে আছি আমি।

উঃ, এলসী আবার বললো, এতো বড়ো শয়তান জিম, স্বামী-স্ত্রীর মতো আমরা বাস করলাম এক বছর, আর এখন বলে কিনা বিয়ে করতে চাই না তোমাকে—

ঠিকই বলে সে, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বললো চৌধুরী, এ ভগবানের বিধান এলসী, আমার সঙ্গে ছাড়া কারুর সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না তোমার।

সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

উত্তর না দিয়ে এলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো চৌধুরী। আনন্দে উজ্জ্বল তার মুখ। একবার নিজের মনের ভেতর তলিয়ে আগাগোড়া দেখলো সে। না, এলসীকে গ্রহণ করতে তার মনে আজ আর একবিন্দু সঙ্কোচ নেই। দূরে পর পর কয়েকটা বাজ পড়লো। তারই শব্দে চমকে উঠলো ওরা দুজন। আর সেই সময় সে-ঘরে ঢুকলো দীনবন্ধু। ওদের ও ভাবে দেখে 'সরি' বলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু এলসীকে তেমনি করেই ধরে রেখে ডাকলো চৌধুরী, দাঁড়াও, শুনে যাও দীনবন্ধু, এলসীকে বিয়ে করবো আমি, তোমাদের আপত্তি নাই তো কোনো? দীনবন্ধুকে দেখে একটু লজ্জা পেলো এলসী। আস্তে আস্তে চৌধুরীর হাত ছাড়িয়ে ঝাঁটা নিয়ে গেলো বাকি ঘরগুলো পরিষ্কার করতে।

হ্যাঁ রে বিটলে? হেসে বললো দীনবন্ধু, তাই ওর চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অতো শখ তোমার? বামুনের ছেলে ম্লেচ্ছকে বিয়ে না করলে ঘুম হবে কেন?

ও আমার গত জন্মের বউ।

থাম থাম, খালি বড়ো কথা মুখে! কিন্তু দুটোতে মিলে যে সকাল-বিকেল খাবে আমাদের ঘাড় ভেঙে সেটি হবে না। বিয়ের

পর পয়সা দিতে হবে তোমায় তা আমি আগে থেকে বলে দিলাম।

বিয়ের পর এখানে তো আমরা থাকবো না দীনবন্ধু।

তবে যাবে কোথায় শুনি? গণশার মতো সাহেব-শ্বশুর নিয়ে কলা দেখাবে নাকি আমাদের?

আরে না না, দেশে ফিরে যাবো।

উঃ, পেটে পেটে হাত-পা তোমার বিটলে, বাস্তু-ঘুঘু তুমি। কতো টাকা আছে তোমার বাছাধন বলো দেখি ঠিক করে?

কিন্তু চৌধুরী কিছু বলবার আগেই সে-ঘরে এলো ক্ল্যারা। একগাল হেসে তাকে চৌধুরীর বিয়ের খবর দিলো দীনবন্ধু। আর তারপর বাড়িময় সাজ সাজ রব পড়ে গেলো।

দেশে যে আবার অমনি করে যাবে সেকথা কোনোদিনও কল্পনা করে নি চৌধুরী। মনের জ্বালায় দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলো সে। দূর সমুদ্রপারের দেশ তাকে দিলো শান্তি। আজ সে তৃপ্ত। তার বিদেশের কাজ শেষ। তারই হারিয়ে-যাওয়া মালতীকে নতুন রূপে সঙ্গে নিয়ে আবার সে ফিরে যাবে দেশে, সাজিয়ে তুলবে তার মনিহারী দোকান। এবার বড়ো করে ইংরেজীতে টাঙাবে সাইনবোর্ড। তাতে লেখা থাকবে, ইংল্যাণ্ড রিটার্ণ্ড স্টেশনার্স। ভিড় কিছু বেশি হবে তার দোকানে, আর দাম একটু বেশি করলেও খদ্দের আপত্তি জানাতে সাহস পাবে না। এখন তার আর কোনো লজ্জা নেই, স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দোকানে বসে থাকবে সে। হয়তো তার মেম-বউ দেখবার জন্যে ভিড় করবে ছেলেমেয়ের দল। অবাক হয়ে তারা তাকিয়ে থাকবে এলসীর মুখের দিকে। তাদের

তাড়া দিয়ে বলবে চৌধুরী, যা যা ছোকরারা, দেখিস কী হাঁ করে? কিন্তু তারা সরে যাবে না, তেমনি করেই দেখবে এলসীকে। আর গোঁড়া আত্মীয়রা, আজও যারা বেঁচে আছে, হয়তো অভিশাপ দেবে তাকে—এলসীকেও তারা পছন্দ করবে না। কিন্তু তবুও মুখ ফুটে বলতে পারবে না কিছু, ইংরেজী বলবার ভয়ে তারা যতোদূর পারে এড়িয়ে চলবে এলসীকে। ভাবনা হলো চৌধুরীর, কেমন করে তার সেই আত্মীয়দের বোঝাবে সে—এ এলসী নয়, এ ইংরেজ বউ নয়, কেন তোমরা চিনতে পারো না একে? এ আমার সেই মালতী। ভগবান আবার তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। যাকে হারিয়ে দেশ ছাড়লাম, তাকে ফিরিয়ে আবার নিয়ে এলাম ঘরে। তাতে যদি না বোঝে তারা, তাহলে গ্রাহ্য করবে না কিছু সে। কার ধার ধারে আর চৌধুরী? সত্য ছাড়া আর কিছু জানে না সে। পরের-দেয়া অর্থহীন অপবাদের জন্যে আজ আর নিরপরাধ এলসীকে সে দেবে না কোনো সাজা। তার জন্ম-জন্মান্তরের এলসী—তার মালতী। আজও হয়তো সেই তিস্তা ঠিক তেমনি করে থেকে থেকে গর্জন তোলে। কিন্তু সে শব্দে আর চমকে উঠবে না চৌধুরী, ঘুমহীন হবে না তার রাত। এলসীকে পাশে নিয়ে হাসিমুখে দোকান চালাবে সে। তারা তারা—কে বুঝবে তোমার লীলা মা, সব তোমারই ইচ্ছা!

দুদিন বাদে তুমি বাড়ির বউ হবে, হেসে ক্ল্যারা এলসীকে বললো, এখনও পাঁচ শিলিং দিতে হবে নাকি তোমায়? তাকে আর বেশি কাজ করতে দেয় না সে, নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করে।

পয়সা চাই না আমি। চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো এলসী, ইণ্ডিয়ায় আমায় নিয়ে যাবে কবে?

বিয়ে হয়ে যাবার পরই। এদেশে আর থাকতে ভালো লাগে না আমার।

শিগগির বিয়ে হবে চৌধুরীর। খুব ভালো আয়োজন করবে এরা। বিয়ে হবে এ বাড়িতেই, আর খাওয়া-দাওয়া হবে ভুপালের দোকানে। চেনা-শোনা সব বাঙালী বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা হবে। বিয়েটা হিন্দু-মতেই করবার ইচ্ছে চৌধুরীর। এখন থেকেই তাই শুরু হয়ে গেছে নানা আয়োজন। খুব খুশী হয়েছে রতন। বন্ধু-বান্ধবের বিয়ের নেমন্তন্ন সে যে কতোদিন খায় নি তার ঠিক নেই। পাশেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে এলসী থাকে। অনাথ আশ্রমে মানুষ। মা-বাবা কিংবা আত্মীয়-স্বজন কাউকেই চেনে না সে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সমস্ত বন্দোবস্ত রতন ঠিক করে ফেলেছে এরই মধ্যে। এলসীকে সম্প্রদান করবে দীনবন্ধু।

স্বভাব গেলো না আজও দীনবন্ধুর। রতনের কথা শুনে সে গালে হাত দিয়ে বললো, বুড়ো বিটলেটাও আমার ঘাড়ে ভর করে পার হবে রে ?

অমন করে কথা বোলো না, ধমক দিয়ে বললো রতন, বিদেশে দেশের ছেলের উপকার আমরা না করলে কে করবে ?

উপকার ? বলি একটি কচি ছুঁড়িকে ওই বুড়ো মিন্সের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার কি চৌদ্দপুরুষের উপকার করবি রে তোরা ?

আঃ, চেঁচাও কেন দীনদা, খোকাবাবু আছে বাড়িতে খেয়াল নেই ? বয়স হলো, এবার একটু মুখ সামলাও।

খোকাবাবুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলো দীনবন্ধু।

ভালো জিনিস কিছু কম দামে পাওয়া যাবে বলে ওরা একদিন এলো আলি সাহেবের বাড়ি কনের জন্যে একটা নেকলেস কিনতে।

চাঁদা করে রতন আর দীনবন্ধু দাম চুকিয়ে দেবে।

কিন্তু দাম বলতে চায় না আলি সাহেব। বলে, দেশের ছেলের সাদি, ব্যবসা করতে পারি তোমাদের সঙ্গে ?

না না, জোর করে রতন, এমনি করলে নেকলেস নিতে পারবো না আমরা।

হো হো করে হেসে আলি সাহেব বলে, নিও না।

কিন্তু দীনবন্ধু প্রচুর অনিচ্ছা দেখিয়ে আস্তে আস্তে তুলে নেয় নেকলেস। বাইরে বেরিয়ে বলে, ওরে, লক্ষ্মী আমাদের ঘর ছেড়ে যাবে না। আর তোকেও তো বলিহারি, লোকটা নেবে না দাম তবু জোর করা কেন ? দে না, দে না আমাকে পাঁচটা শিলিং ? সে বেলা হুঁশিয়ার। ও ছাতার কয়েক পাউণ্ডে কী হয় আলির ? অনেক পয়সা ওর। তেলো মাথায় তেল ঢেলে কোনো লাভ নেই, বুঝলি গাধা ?

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। অধৈর্য হয়ে শুধু দিন গোনে চৌধুরী। বিয়েটা তাহলে খুব ঘটা করেই হবে তার !

দিন কয়েক পরে হঠাৎ অসময়ে এলো এলসী। চৌধুরী বাড়িতেই ছিলো তখন। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না করে এলসী দেখা করলো ক্ল্যারার সঙ্গে। ক্ল্যারা তাকে জানালো চৌধুরী ঘরেই আছে।

না, আমার দরকার তোমার সঙ্গে, ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে এলসী বললো, সেই যে একদিন কাজ করেছিলাম—এ বাড়ির বউ হবো বলে পয়সা দাও নি তুমি, সে পাঁচ শিলিং নিতে এলাম আজ।

ক্ল্যারা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই এলসী বলে গেলো আবার, ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করতে আমার দায় পড়েছে। বড়ো

নোংরা ওরা। ইংরেজ হয়ে তুমি ওদের সঙ্গে এ বাড়িতে থাকো কেমন করে?

কী বলতে চাও তুমি? শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো ক্ল্যারা।

এলসী চাপা স্বরে আস্তে আস্তে বললো যে জিম আবার ফিরে এসেছিলো তার কাছে। বড়ো অনুতপ্ত বেচারা। ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করবো শুনে নাক সিঁটকে বললো যে এলসী বড়ো বোকা, বিদেশীকে ইংরেজ মেয়ের কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়। জিমই তাকে বিয়ে করবে। এই কথা বলতেই এসেছে এলসী আজ। আর সেই পাঁচ শিলিং-এরও তার বড়ো দরকার, সেটাও চাই এখুনি।

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা বলে যাও—

না, আমার অতো সময় হবে না এখন ওর সঙ্গে বকর-বকর করবার। তুমি বলে দিও ওকে এক সময়। জিম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। হ্যাঁ, আর আমি কাজ করতে আসবো না এখানে—

ক্ল্যারার কাছ থেকে পাঁচ শিলিং নিয়ে এলসী চলে গেলো।

মিঃ চাড্‌রী? খুব আস্তে চৌধুরীর ঘরে টোকা দিয়ে ডাকলো ক্ল্যারা।

কিন্তু চৌধুরীর কানে গেলো না সে আওয়াজ। তার চোখের সামনে তখন জলপাইগুড়ির আমবাগান—দূরে ছবির মতো অস্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা আর কড়লার ছলোছলো কালো জল। পাশেই তার মনিহারী দোকান। সেখানে ঝুলছে বিরাট সাইন বোর্ড—

মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী
ইংল্যাণ্ড রিটার্ণ্ড স্টেশনার্স

আর থেকে থেকে তিস্তার তরঙ্গ থেকে শব্দ ভেসে আসছে—গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

১১

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এস্ এস্ অ্যালক্যানটারা জাহাজে ভূপাল মাস কয়েকের জন্যে দেশে ফিরে গেলো। তার স্ত্রী বিশেষ ভাবে লিখেছিলো এ বছর পুজোর সময় তাকে থাকতেই হবে তার পাশে। লণ্ডনের শীত এড়াতে ভূপালও চেয়েছিলো এ বছর। ফিরে আসবে আবার সে গ্রীষ্মকালে, সেই মে-জুন মাসে। ততোদিন রতন আর আইলীনকে চালাতে হবে রেস্তোরাঁ। মেরী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তবু ইচ্ছে করেই নতুন লোক রাখলো না ওরা।

যাবার আগের দিন রাত্তিরে বড়ো কান্নাকাটি করেছিলো ভূপাল। অনেকবার নাকি যাওয়া নাকচ করে দিতে চেয়েছিলো। আইলীন বলে রতনকে, আমি বললাম, না যাও তুমি, আমার কথা তোমার স্ত্রীকে খুলে বলো সব। তারপর আবার ফিরে এসো, তখন আমরা দুজন চিরকালের জন্যে থাকবো এক সঙ্গে।

রতন কিন্তু এসব কথা কিছু জিজ্ঞেস করে না আইলীনকে। এখন তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই একেবারে। ভূপাল যখন বিশ্বাস করে সমস্ত ভার দিয়ে গেছে তার ওপর তখন একচুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না সে। যদি এই কমাসে রেস্তোরাঁর আয় বাড়িয়ে দিতে পারে তাহলেই সার্থক হবে ওর পরিশ্রম। ভূপাল ফিরে এসে দেখুক, ইচ্ছে করলে রতন কী না করতে পারে। রোজ আসে সে খুব সকালে, রবিবারও বাদ যায় না। ভোর

সাড়ে ছটায় চৌধুরী তাকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

কিন্তু চৌধুরীর কী যে হয়েছে কদিন থেকে, ভেবে পায় না রতন। একটা সামান্য মেয়ের জন্যে অমন ভেঙে পড়ে নাকি মানুষ! চোখ বসে গেছে চৌধুরীর। ভালো করে খায় না সে আজকাল। শুধু দিন-রাত শুকনো মুখে গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবে। আর থেকে থেকে বলে মা, তারা তারা!

একটা মেয়ে গেছে তো কী হয়েছে? ছোটো ছেলে নাকি তুমি আঁ্যা? অমন কতো জুটবে লণ্ডন শহরে—

শালার বুড়োকে ধেড়ে রোগে ধরেছে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, এখনো বিটলের টোপর পরে বর সাজবার বাসনা। দীনবন্ধু ফ্যা ফ্যা করে হাসে।

সান্ত্বনা দেয় ক্ল্যারা, আমি তোমার জন্যে মেয়ে দেখে দেবো। আমাদের শহরের মেয়েরা লণ্ডনের মেয়ের মতো এমন করে মানুষকে ঠকাতে জানে না। অমন করে থেকো না চৌধুরী, ওঠো, যাও একটু বেড়িয়ে এসো—

কিন্তু সে সব কথা চৌধুরীর কানে যায় কি না বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি করেই ম্লান মুখে বসে থাকে সে। বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পারছে চৌধুরী, দিনে দিনে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। ক্লান্তি আসে, মাথা ঘোরে, একটুতেই হাঁপ ধরে। এমন হলে আর হয়তো বেশিদিন বাঁচবে না সে। কিন্তু আর বাঁচতে চায় না চৌধুরী। ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছে সে—চুরমার হয়ে গেছে তার সোনার স্বপ্ন। এ কী করলে মা! মালতীকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার এমন করে হরণ করলে কেন? এ কেমন লীলা তোমার! চৌধুরীর এতোদিনের বিশ্বাস গোলমাল হয়ে যায়।

তবু প্রাণপণে ভগবানকে ডাকবার চেষ্টা করে সে, শক্তি দাও, তারা তারা। গলা দিয়ে স্বর বার হয় না তার। হয়তো আরও কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছে। হয়তো বিয়ের পর মালতী আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে তার কাছে। ঠিক ঠিক, চৌধুরী বলতে চেষ্টা করে, তারা তারা। ভগবান সবই করছেন মিলিয়ে মিলিয়ে। বিয়ের পরই তো মালতীকে সে গৃহহারা করেছিলো—কুমারী অবস্থায় সে ফিরে আসবে কেমন করে! ঠিক ঠিক, সে ফিরে আসবে বিয়ের পর। আর যে-সন্তান মালতীর পেটে ছিলো সেই সন্তান বুকে বয়েই তো ফিরে আসতে হবে এলসীকে। দুহাত বাড়িয়ে তখনি তাকে ঘরে তুলে নেবে চৌধুরী। তারা তারা! তোমাতে বিশ্বাস রাখতে দাও মা—মনে বল দাও! তবু চৌধুরীর চোখের সামনে যেন অন্ধকার নামে। কিছুতেই আর ভগবানে বিশ্বাস রাখতে পারে না। খুব ভোরে যখন রতনকে ডেকে তোলে তখন জোর করে গলা দিয়ে স্বর বের করতে হয় তাকে।

অনেক দিন পর রতনের নামে বিষ্টুর চিঠি এলো একদিন। বিয়ের পর এই প্রথম চিঠি বিষ্টুর। অনেক কথা লিখেছে সে—লম্বা চিঠি। খুব ছোটো অক্ষর। পড়তে অনেক সময় লাগলো রতনের।

এতোদিন লজ্জায় সে লিখতে পারে নি রতনকে। মেম বিয়ে করে আগেকার বউকে পুড়িয়ে মারার জন্যে রতনের কাছে আজও বিষ্টু খুবই লজ্জিত। আজও মাঝে মাঝে দুর্গার কথা মনে করে চোখের জল ফেলে সে। রতন কি একথা বিশ্বাস করবে? এই

এক কথাই অনেক বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখেছে বিষ্টু। আরও লিখেছে, ক্ল্যারার কোনোই দোষ নেই, দুর্গার চেয়েও হাজার গুণে ভালো মেয়ে সে। রতন তার সে পরিচয় এতোদিনে বেশ ভালো ভাবেই পাচ্ছে নিশ্চয়। দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তো সে বিষ্টুর। কাজেই ক্ল্যারার ওপর যেন কোনো রাগ না রাখে রতন। যা হয়ে গেছে তা তো হয়ে গেছেই—তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন আর লাভ কী? দুর্গা তো আর ফিরে আসবে না। তাই সব ভুলে ক্ল্যারাকে নিয়ে সুখী হতে চায় বিষ্টু। দেশের মেয়ের মতো শান্ত-শিষ্ট ভালো মেয়ে ক্ল্যারা। এখন যদি রতন বিষ্টুকে ক্ষমা না করে তাহলে কিছুতেই সে সুখী হতে পারবে না। রতনের চেয়ে বড়ো বন্ধু আজ আর তার কেউ নেই।

এতোটা পড়ে মনে মনে হাসলো রতন। বিষ্টুর তাকে অতো ভয় কেন? কী ধার ধারে সে রতনের? আর এতো করে এসব কথা তাকে লেখবারই বা কী দরকার। মানুষ অন্যায় করলে বোধহয় মনে করে অন্য লোক সব সময় শুধু তার দোষটাই বড়ো করে দেখে। আর একবার হেসে রতন আবার চিঠি পড়তে আরম্ভ করলো।

কিন্তু আসল কথা লিখেছে বিষ্টু শেষের দিকে। লিখেছে, ক্ল্যারাকে বিয়ে করে অবশ্য একটা মস্ত লাভ হয়েছে তার, যেটা দুর্গা বেঁচে থাকলে কিছুতেই হতো না। মেমসাহেব বিয়ে করেছে বলে টমাস্ কুক্ কোম্পানির এক সাহেব তাকে বোম্বাই-এ একটা চাকরি দেবে বলেছে। মাল-পত্র চালান করা আর জাহাজ থেকে মাল খালাস করার কাজ তার। বোম্বাই-এ থাকতে হবে তাকে। মাইনে যা দেবে বলেছে সাহেব তাতে দুজনের থাকা-খাওয়ার খরচ

মোটামুটি একরকম করে চলে যাবে। তা ছাড়া উপরি আয়ও আছে সে-চাকরিতে। কাজেই ক্ল্যারাকে সে এপ্রিল-মে মাসে দেশে নিয়ে যাবে। জাহাজে জাহাজে ঘুরতে আর ভালো লাগে না তার। তবু ভগবানের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। জাহাজের চাকরিটা নিয়েছিলো বলেই তো বোম্বাই-এ এই চাকরি পাওয়ার সৌভাগ্য হলো তার। জাহাজেই টমাস্ কুক কোম্পানির সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিষ্টুর। ইচ্ছে করলে চাকরিটা এখুনি পেতে পারতো সে, কিন্তু নিজেই নেয় নি। কারণ জাহাজ-কোম্পানির খরচেই সে আর একবার বিলেত আসা-যাওয়া করতে চায়। তাহলে ভাড়া লাগবে শুধু ক্ল্যারার, বিষ্টুর খরচ লাগবে না এক পয়সাও। এসব কথা লিখে আরও লিখেছে বিষ্টু, ক্ল্যারাকে লণ্ডনে তাদের বাড়িতে রাখার জন্যে সে যে কতোখানি কৃতজ্ঞ রতনের কাছে তা বলতে পারে না। ক্ল্যারাকে সে আলাদা কোনো চিঠি লিখলো না, কারণ কোনো রকমে এক লাইনও ইংরেজী বেরোয় না তার কলম দিয়ে। সামনে থাকলে মুখে তবু কাজ চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু লিখতে গেলে কিছু বানানই করতে পারে না সে। একথা যেন রতন ভালো ভাবে ক্ল্যারাকে বুঝিয়ে বলে, তার শরীরের কুশল জানায় আর গ্রীষ্মকালে তার সঙ্গে চলে আসবার জন্যে তৈরি থাকতে বলে। তারপর দীনবন্ধু চৌধুরী আর সকলের খবর নিয়ে, সে খুব ভালো আছে জানিয়ে, রতন কেমন আছে, শিগগির বিয়ে করছে কিনা, লণ্ডনে এখন শীত কি রকম—এই সব জানতে চেয়ে, বিষ্টু তার পাতা সাতেকের লম্বা চিঠি শেষ করেছে।

চিঠি শেষ করে রতন ভাবলো, বড়ো বোকা বিষ্টু, তার ঠিকানা দেয় নি। ইচ্ছে থাকলেও উত্তর দিতে পারবে না রতন। চিঠিতে

পোস্ট আপিসের ছাপ দেখলো সে সিলোনের। আরে তাই তো, রতন নিজেও তো বোকা কম নয়। জাহাজে জাহাজে ঘোরে বিষ্টু, ঠিকানা দেবে কেমন করে? মাথাটা বোধহয় একটু খারাপ হয়েছে রতনের।

চিঠি পড়ে মনটা হঠাৎ দমে গেলো তার। বিষ্টুর এসে পড়বার আর তো খুব বেশি দেরি নেই। মাস কয়েক মোটে। তারপর বউকে নিয়ে সে চলে যাবে। বাড়ি আবার হয়ে যাবে খালি। আবার যে কে সেই। তিনদিন দাড়ি না কামিয়ে ঢেকুর তুলে ঘুরে বেড়াবে চৌধুরী। আবার সেই নোংরা কিচেন, নোংরা বাথরুম। রাশি রাশি জঞ্জাল জমে উঠবে চারপাশে—আবার সারা বাড়িতে দুর্গন্ধ। ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে এখন রতনের। ক্ল্যারা যেন এ বাড়ির লক্ষ্মী। তাকে বাদ দিয়ে এ বাড়িতে বাস করবার কথা আর ভাবতে পারে না রতন। তার বুক খালি হয়ে যায়, হু হু করে ওঠে প্রাণ। সেই ক্ল্যারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে একদিন।

ক্ল্যারা, তার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলো রতন।

কি?

বিষ্টু চিঠি লিখেছে।

কই না তো!

আমাকে লিখেছে—তোমার কথা লিখেছে অনেক।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ক্ল্যারার মুখ। লিখেছে? কী লিখেছে? আমাকে এতোদিন একটাও চিঠি লেখে নি কেন?

তখন রতন কষ্টে-স্পষ্টে বিষ্টুর চিঠির সারাংশ বুঝিয়ে দিলো, আর তাকে কেন লেখে নি সে কথাও বললো ভালো করে।

ওমা, কী মজা, এতো শিগগির ইণ্ডিয়ায় যাবো আমি ?

হ্যাঁ।

বলো বলো, আর কী লিখেছে ?

বললাম তো সব।

বড়ো ছোটো চিঠি লেখে বিষ্টু, ক্ল্যারার উৎসাহ একটু কমে গেলো যেন।

ক্ল্যারা !

কী ?

তার একটা হাত ধরে বললো রতন, বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

যেখানে যেতে চাও।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ক্ল্যারা। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বললো, না।

কেন ক্ল্যারা, তুমি রাগ করেছো আমার ওপর ?

জানি না।

বলো কী দোষ আমার ?

কিছু বলবো না আমি।

ছিঃ ক্ল্যারা, ঝগড়া কোরো না আমার সঙ্গে।

ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়।

তবে এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলছো কেন ? আবার ক্ল্যারার হাত ধরলো রতন।

না, একটু দূরে সরে গিয়ে ক্ল্যারা বললো, আমার সঙ্গে বেশি আত্মীয়তা করতে এসো না রটন, তোমাকে আমার ভালো লাগে না।

আমি জানি, হেসে রতন বললো, একথা অনেকবার শুনেছি। কারুরই আমাকে ভালো লাগে না। রতন থামলো। সিগ্রেট ধরিয়ে একটু পরে বললো, তোমাকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ক্ল্যারা—

তাই বুঝি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাও ?

হ্যাঁ।

আমি খুব দুঃখিত, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় হবে না।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। রতন নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে লাগলো। বিষ্টুর খোলা চিঠির ওপর চোখ রেখে একটু পরে থেমে থেমে বললো, তুমি—তুমি যে চলে যাবে ক্ল্যারা! এই বাড়ি, এই অল্ডগেট, এই দেশ ছেড়ে অনেক দূরে তুমি চলে যাবে, হয়তো আর কোনোদিনও দেখা হবে না তোমার সঙ্গে, তাই—

তাই আমি চলে গেলে তোমাদের অসুবিধার কথা মনে করে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুঝি ?

এ তুমি কী বলছো ক্ল্যারা ?

তাহলে ?

তুমি কি মনে করো আমি এতো স্বার্থপর ?

তাই তো মনে হয়। এ বাড়িতে আসবার পর থেকে নিজের সুখ-দুঃখ সমস্ত ভুলে গেছি আমি। শুধু তোমাদের প্রত্যেককে সুখী করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। সকলেই স্নেহ করেছে, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আমায়। শুধু তুমি—

আমি কী করেছি ক্ল্যারা ?

হাসিমুখে কখনও কথা বলো নি আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি, অথচ এমন ব্যবহার তুমি করেছো যেন

আমি ডাইনী—তোমার বন্ধুকে জাদু করে তার বউকে পুড়িয়ে মেরেছি—

না না একথা ভুল—রতন কী বলবে ঠিক করতে পারলো না।

না রতন, চাপা হাসি হেসে ক্ল্যারা বললো, ভেবো না দয়া ভিক্ষে করছি তোমার। ভেবেছিলাম কোনোদিনও কোনো নালিশ জানাবো না তোমাদের কারুর কাছে। আমি ডাইনী বিদেশিনী হলেও মানুষ। তাই শুধু দেখতে চেয়েছিলাম কতো নিষ্ঠুর হতে পারো তুমি—

ছলছল করে উঠলো রতনের চোখ। অনুতাপের গ্লানিতে ভরে উঠলো তার মন। সত্যি মায়া-দয়া বলে তার কিছু নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী ভেবে নিয়ে ক্ল্যারার মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে সে শুধু বললো, ফরগিভ্ মি ক্ল্যারা!

আরও অনেক কথা বলতে চেয়েছিলো রতন, কিন্তু ভাষা হলো প্রতিবন্ধক। ইংরেজীটা কেন ভালো করে শিখলো না সে ভগবান! মাথা নিচু করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনে গেলো রতন। ক্ল্যারার ঘরের পাশেই কিচেন। সেখানে বসে দীনবন্ধু রুটিতে পুরু মাখন মাখিয়ে কামড় দিচ্ছে।

রতনকে দেখতে পেয়েই হেসে বললো, কি রে, মান-অভিমানের পালা চুকলো? বলি হ্যাঁ রে রতনা, তুইও উড়ছিস? তা ওড়্—ওড়্, তবে দেখিস শেষ অবধি টাল সামলাস বাপু। না হলে ওই বিটলেটার মতো কানের কাছে দিন-রাত্তির গোঙাস যদি, তাহলে আমাকেও একটা কিছু করে হাপুস নয়নে তোদের সঙ্গে তাল রাখতে হবে। ব্যাস, তা হলেই একেবারে ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর—এই অল্ডগেটে বসেই অক্ষয় স্বর্গ বাস!

সে-ঘর থেকেও তখুনি বেরিয়ে গেলো রতন।

যতো ভাবে পরের ভাবনা একেবারে ভাববে না, তবু মাঝে মাঝে পরের ভাবনায় ঘুম হয় না রতনের। আজকাল থেকে থেকে তার দীনবন্ধুর কথা মনে হয়। নিজের মেয়ে আর পরিবার ছেড়ে আর কতোদিন সে থাকবে এখানে? একটু কি ক্লান্তি আসে না ওর? যদি রতনের টাকা থাকতো তাহলে এই মুহূর্তে সে ফিরে যেতো দেশে, নিজের দেশে সোনার সংসার পাততো, তার সোনার বউকে খুঁজে নিয়ে জগৎ ভুলে যেতো। দীনবন্ধুর হয়তো টাকা আছে, কতো তা সে ঠিক জানে না। তবু কেন দেশে ফিরে যায় না দীনবন্ধু, কী মোহে সে পড়ে আছে এ দেশে? বয়স তো কম হয় নি তার। দেশের জন্য কি একটু কাঁদে না ওর প্রাণ? আজ বহুদিন থেকে সে বলছে ব্যবসা না করে অনেক টাকা না নিয়ে দেশে ফিরবে না। এদেশে এতোদিন থেকে দেশের সেই ছোটো বাড়ির ছোটো ঘরে এখন তার পক্ষে বাস করা একেবারেই অসম্ভব! তাই অনেক টাকা করতে চায় দীনবন্ধু। রতন ভাবে, শুধু পরের কাছে ধার করে কেমন করে টাকা করবে দীনবন্ধু। মূলধন তো কিছু চাই ব্যবসার। সে-টাকা কোথায় পাবে সে! দীনবন্ধু কিন্তু ওসব কথা ভাবে বলে মনে হয় না। তবু সে বলে, ব্যবসা করবো, অনেক টাকা যতোদিন না হয় ততোদিন দেশে ফিরবো না। কতো রকম লোক যে আছে পৃথিবীতে! দীনবন্ধুর কথা ভেবে রতন হাসে মনে মনে।

একদিন এমনি ভাবনা ভাবছে যখন রতন, ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকে বললো দীনবন্ধু, এই রতনা, বড়ো দরকার, চট করে দে তো পাঁচটা পাউণ্ড এখুনি—

টাকা এখন নেই আমার।

কি বললি? দরকারের সময় দিবি না আমাকে তুই?

কী দরকার তোমার? শুধু মদ খেয়ে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করবার জন্যে আর এক পেনিও তোমাকে আমি দেবো না কোনোদিন—

ওরে আমার বাপ রে! বড়ো মুখ হয়েছে যে তোর আজকাল। বলি এতো কথা শেখালে কে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে রতন বললো, এবার বাড়ি ফিরে যাও দীনদা, বয়স হলো, কোনদিন মরে যাবে এখানে।

দেশে ফিরতে বললেই চটে যায় দীনবন্ধু। আজও রতনের কথায় ক্ষেপে উঠে বললো, উঃ, সৎপরামর্শ দিচ্ছে। বলি দেশে গিয়ে করবোটা কী শুনি? এই বয়সে দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করবো রে? এখানে তবু খাওয়া-পরার ভাবনা নেই!

এখানকার মতো চাকবের কাজ সেখানেও পাবে তুমি।

তাতে আমার লাভটা হবে কি রে? বিলেত থেকে ফিরে ইণ্ডিয়ায় চাকর হবো আমি?

তাহলে পরিবারকে আনিয়ে নাও এখানে?

দিবি? দিবি টাকা তুই?

টাকা তো আছে তোমার।

তোর মাথা আছে। আর আমি যদি হঠাৎ মরে যাই এখানে পরিবারকে দেখবি তুই?

কিন্তু এখন তাদের দেখছে কে?

দীনবন্ধু কিছুক্ষণ উত্তর দিলো না। একটু পরে বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, শোন রতনা, ব্যবসা আমি করবোই, তারপর অনেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরবো।

সে তো এসে অবধি শুনছি।

আরে থাম, বলি ব্যবসা রাতারাতি হয় রে? সময় লাগে তাতে। আমেরিকা যাবো আমি।

কবে?

নাও বাপু। বলি মুখ থেকে কথা খসিয়েছি বলে কি এখুনি ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে নাকি রে? থাম থাম, সবুর কর দুদিন। দেখ না ইণ্ডিয়া হাউসের মাথায় ভর করে আমেরিকা পৌঁছলাম বলে। সেখানেই ব্যবসা শুরু করবো ঠিক করেছি।

কিসের ব্যবসা?

আরে মলো যা। বলি অতো খবরের তোর দরকার কী রে? রইলি এতোদিন বিলেতে, এখনও আদব-কায়দা শিখলি না একটুও, খালি পরের ব্যাপারে নাক গলাবার ফন্দী! একটু থেমে বার কয়েক কেশে বললো দীনবন্ধু, কিসের ব্যবসা সেটা ঠিক করি নি কখনও। আমেরিকা গিয়ে বাজার বুঝে তারপর তো ব্যবসা—শুনলি রে? আর বুঝলি রতনা, বড়ো সুন্দর মেয়েমানুষ সেখানে, তোদের লণ্ডনের মতো কাঠের পুতলী নয় রে—

বুড়ো বয়সে এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

থাম থাম, মারবো এক থাবড়া। মানুষ করে দিলাম তোকে, এখন আমাকেই দিচ্ছিস বক্তৃতা। কথায় বলে না কারুর ভালো করতে নেই।···আচ্ছা অনেক হয়েছে, নে নে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো বের কর তো পাঁচটা পাউণ্ড—

রতন কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা চিঠি হাতে করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো খোকাবাবু। তার পাশের খবর এসেছে আজ। খুব ভালো করে পাশ করেছে বঙ্কিম।

বাঃ বাঃ! ওরে রতনা শাঁখ বাজা,—খোকাবাবুকে কাঁধে তুলে নিলো দীনবন্ধু।

কিন্তু কিছুতেই তার বাবাকে চিঠি লিখতে চায় না খোকাবাবু। বলে আমার মা নেই। আর বাবার কী কাণ্ড দেখুন, কার উড়ো চিঠিতে বিশ্বাস করে কী বিপদেই ফেলে দিলেন আমাকে! আপনাদের সঙ্গে দেখা না হলে কী করতাম আমি বলুন তো। তাই বাবাকেও জব্দ করতে চাই আমি এবার, মরে গেলেও কোনো খবর দেবো না। একটা চাকরি খুঁজে নেবো এখানে, তারপর নিজের পয়সায় দেশে ফিরে হোটেলে উঠবো, দেখাও করবো না বাবার সঙ্গে কোনোদিন।

খোকাবাবু সারাদিন বলে এমনি আরও অনেক কথা।

ছি ছি ছি খোকাবাবু, দীনবন্ধু বোঝায় তাকে, বিলেতে লেখাপড়া শিখে এতো অবুঝ হতে হয় কখনও? কতো আশা তোমার ওপর তোমার বাবার, কতো সাধ করে তিনি তোমাকে এদেশে পাঠিয়েছেন মানুষ হবার জন্যে। তোমাকে রাঙা টুকটুকে বউ খুঁজে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিশ্রাম করবার বয়স এখন তাঁর। তাই তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে কতো দুঃখ পাবেন তিনি বলো তো? এই বয়সে তাঁকে এমন করে দুঃখ দেয়া তোমার কি উচিত খোকাবাবু? আর একদিনও এদেশে থেকে সময় নষ্ট কোরো না খোকাবাবু। তুমি ফিরে যাও।

কিন্তু তিনি কি আমার কথা ভেবেছিলেন?

বাপ ছেলের কথা ভাবে না এ কি সম্ভব খোকাবাবু? শত্রুর অভাব তো নেই দেশে, কারুর ভালো কেউ দেখতে পারে না সংসারে। তাই কে না কে তাঁকে যা-তা লিখে দিয়েছে তোমার

নামে। এদেশের কথা কী ভাবে আমাদের দেশের বুড়ো মানুষরা তা তো জানোই। কিন্তু তুমি তো ভালো করে পাশ করলে খোকা-বাবু—এবার সকলের ভুল ভেঙে দেয়াই তোমার কাজ। যাও, দেশে ফিরে বড়ো কাজ করে তুমি দেখিয়ে দাও যে এদেশে এলেই লোকে খারাপ হয় না, তোমার মতো সোনার চাঁদ ছেলে মানুষ হয়েও দেশে ফিরে যায়। তুমি ফিরে যাও খোকাবাবু, দশের মুখ রাখো, দেশের নাম রাখো, আর আজই সব কথা তোমার বাবাকে গুছিয়ে সব লিখে দেশে ফেরার ভাড়া চেয়ে পাঠাও। এবার আর তিনি তোমায় অবিশ্বাস করবেন না খোকাবাবু। বঙ্কিমের হাত ধরে এতো কথা বলতে গলা ধরে এলো দীনবন্ধুর।

দিন পনেরো পরে বঙ্কিমের বাবার কাছ থেকে এলো তিন হাজার টাকার ড্রাফট্। ছেলেকে না দেখে আর একদিনও থাকতে পারছেন না তিনি—কোনদিন মরে যাবেন ঠিক কি! কাজেই টাকা পেয়েই যেন অবিলম্বে বঙ্কিম প্লেনে ফিরে আসে। জাহাজে অনেকদিন সময় লাগে, অতোদিন কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না তিনি। বঙ্কিমের জন্যে তিনি খুব ভালো চাকরি ঠিক করে রেখেছেন, আর এর মধ্যেই দেখে রেখেছেন সুন্দরী বউ। ব্যারিস্টার রায় সাহেবের মেয়ে, চমৎকার পিয়ানো বাজায়। তাই বঙ্কিম যেন চিঠি পেয়েই উড়ে আসে তার বাবার কাছে। আর, যে তাঁর কাছে ছেলের নামে মিথ্যা কথা লিখেছিলো তাকে সহজে ছাড়বেন না তিনি।

আপনি ঠিক বলেছেন দীনদা। বাবা টাকা পাঠিয়েছেন, প্লেনে ফিরতে হবে আমাকে।

দেখলে খোকাবাবু, দেখলে বাপের প্রাণ!

চেকটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে বঙ্কিম বললো,

আপনারা আমার যে উপকার করেছেন সে-ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। তবু আজ যখন টাকা এসেছে, তখন আমার এতো দিনের থাকা-খাওয়ার খরচটা নিতেই হবে আপনাদের।

ছি ছি ছি ছি, এ একটা কথা হলো খোকাবাবু? আমাদের দেশের ছেলে তুমি, তোমাকে পাশ করিয়ে দিলাম আমরা—তাতেই কি উঠে যায় নি আমাদের খরচ? আর এখানে এভাবে একসঙ্গে থাকলে কিছুই তো আলাদা খরচ তোমার জন্য হয় না। বড়ো লোকের ছেলে তুমি, এভাবে তোমাকে রাখতে দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিলো খোকাবাবু।

ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না দীনদা। আপনাদের কথা আমি জীবনে ভুলবো না।

দিন কয়েকের মধ্যে প্লেন পাওয়া গেলো।

কাল বিকেলে হীথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়বে বঙ্কিমের প্লেন। রতন দীনবন্ধু আর চৌধুরীকে উপহার দিয়েছে সে সিল্কের দামী সার্ট আর টাই। ক্ল্যারাকে দিয়েছে লাল রঙের হ্যাণ্ড ব্যাগ।

সকলের মন থমথম করছে—আর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে বঙ্কিম ছেড়ে যাবে তাদের। দেশের কথা মনে পড়ছে আজ সকলের। ওদের কাঁদিয়ে কাল চলে যাবে খোকাবাবু। পড়তে এসেছিলো—কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে যাচ্ছে ঘরের ছেলে। আর ওরা! সেই সব কথা মনে পড়ছে প্রত্যেকের। এমনি করে কবে তারাও ফিরে যেতে পারবে! কিন্তু যাবে কোথায়! খোকাবাবুর বাবার মতো সাজানো বিরাট বাড়ি নিয়ে কে বসে আছে ওদের জন্যে!

রাত্তিরে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো ক্ল্যারা। হয়তো কাল আর এখানে খাওয়ার সময় হবে না বঙ্কিমের। তাই ক্ল্যারা তার হাত ধরে বললো, এ বাড়িতে আজ তোমার লাস্ট সাপার—

রতন বাড়িতে নেই। আরও ঝিমিয়ে পড়েছে চৌধুরী। গভীর কুয়াশায় অন্ধ চারপাশ। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে আজ সন্ধ্যে থেকে। রাস্তায় শুধু দিশাহারা পথিকের কলরব। খাওয়ার পর বঙ্কিমকে দীনবন্ধু নিয়ে এলো তার ঘরে।

বসো বসো খোকাবাবু, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে। কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বেরোয় না দীনবন্ধুর মুখ থেকে। বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সে বসে থাকে। আজ খোকাবাবু বসে আছে এই ঘরে তার সামনে, কাল এতোক্ষণে সে কোথায় চলে যাবে—কতোদূর—দীনবন্ধু ভাবে সেই কথা।

খোকাবাবু?

কি দীনদা?

তোমার খুব ভালো লাগছে, না খোকাবাবু?

আপনাদের ছেড়ে যেতে কষ্টও আমার খুব হচ্ছে দীনদা। এতো যত্ন এতো উপকার কেউ কি করে আজকাল কারুর জন্যে?

ছি ছি, ওকথা বলে আর আমাদের পাপ বাড়িও না খোকাবাবু। ওপরে তাকিয়ে দীনবন্ধু বললো, দুদিন সবসুদ্ধ লাগবে তোমার, না?

বঙ্কিম মনে মনে হিসেব করে বললো, যদি প্লেন ঠিক সময়ে ছাড়ে তাহলে দুদিনেরও কিছু কম।

তারপর তুমি দেশে পৌঁছে যাবে খোকাবাবু। কতো বড়োলোক হবে তুমি, তখন কি আর আমাদের মনে রাখবে!

আপনাদের ভুলবো আমি!

আবার চুপচাপ। আর কোনো কথা খুঁজে পায় না দীনবন্ধু। ক্ল্যারা বাসন ধুতে ধুতে গান গাইছে, শুধু ভেসে আসছে তারই গানের কলি। আস্তে আস্তে উঠে দীনবন্ধু বঙ্কিমের একটা হাত চেপে ধরলো, খোকাবাবু আমার একটা উপকার করবে?

আশ্চর্য হয়ে বঙ্কিম বললো, একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন দীনদা? আপনাদের কোনো কাজ করতে পারলে আমি সত্যি খুশী হবো। বলুন কী করতে হবে আমাকে?

শেয়ালদা স্টেশনের দিকে কখনও গিয়েছো খোকাবাবু?

কতোবার!

বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন চেনো?

খুব চিনি।

ব্যাস, তাহলে ঠিক আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে খুব সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীনবন্ধু খুললো তার বহুদিনের পুরোনো স্টীল ট্রাঙ্ক। সেখান থেকে বের করলো একটা বড়ো বিলিতি ডল্ আর এক শিশি ওষুধ। তারপর আবার বঙ্কিমের পাশে বসে বললো, আমি যখন এখানে আসি সে আজ তেরো-চোদ্দ বছর আগের কথা খোকাবাবু। আমার স্ত্রী হার্টের অসুখে ভুগছিলো তখন। এখানে ভালো ইংরেজ ডাক্তারের কাছে রোগের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে এই ওষুধ নিয়েছি আমি—আর আমার মেয়ের জন্যে কিনেছি এই পুতুল। তুমি যদি তাদের কাছে দয়া করে এগুলো পৌঁছে দাও খোকাবাবু—

নিশ্চয়ই দেবো দীনদা, বাড়ির নম্বরটা কতো বলুন।

তখন ছিলো সাত নম্বর বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন। কিন্তু আমি

জানি না এখন তারা কোথায়, বেঁচে আছে না মরে গেছে। তবু কথা দাও খোকাবাবু, যদি বেঁচে থাকে তুমি গিয়ে তাদের খুঁজে বের করবে। ও পাড়ায় গিয়ে বললেই হবে, সেই জাহাজের চাকরি নিয়ে যে বিলেত গিয়েছিলো তার পরিবার, তাহলে পাড়ার কোনো না কোনো লোক নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের খবর বলে দেবে। বলো খোকাবাবু আমার এ উপকার করবে তুমি ?

অমন করে বলবেন না দীনদা, কলকাতায় পৌঁছে যেমন করে হোক আমি আপনার বাড়ি খুঁজে বের করবোই।

খুব জোরে বঙ্কিমের হাত চেপে ধরে বললো দীনবন্ধু, তোমার ভালো হবে, আমি বলছি তুমি মানুষ হবে, অনেক—অনেক বড়ো হবে তুমি খোকাবাবু—

উত্তেজনায় দীনবন্ধুর সমস্ত শরীর কাঁপছিলো।

পরদিন কুয়াশার জন্যে খোকাবাবুর প্লেন যথাসময় ছাড়লো না, উড়লো রাত্তির দশটায়। ক্ল্যারা রতন চৌধুরী দীনবন্ধু সকলেই গিয়েছিলো এয়ার পোর্টে।

ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলো চৌধুরী। এরা তাকে কিছুতেই সামলাতে পারছিলো না। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো সকলের। বিছানায় গড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো চৌধুরী।

চুপ করো চৌধুরী, ছেলেমানুষি কোরো না। এই মন নিয়ে কেউ দেশের বাইরে বেরোয় !

খোকাবাবুকে পৌঁছতে যাবে বলে আইলীনের ওপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আজ ছুটি নিয়েছিলো রতন। কাল খুব সকালে গিয়ে পৌঁছতে হবে তাকে। না হলে বড়ো মুশকিলে পড়বে বেচারী

আইলীন। কিন্তু চৌধুরীর অবস্থা দেখে তার ভয় হচ্ছিলো। সারা রাত এমন করলে ঠিক ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়বে সে, আর তাহলে কিছুতেই রতনকে তুলে দিতে পারবে না ভোর বেলা।

কাল আমাকে আরও সকালে তুলে দিও ভাই, রতন পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো রতনের। যা ভেবেছিলো তাই। চৌধুরী তাকে তুলে দিতে পারে নি ভোর বেলা।

বলে দিলাম অতো করে, কম্বল সরিয়ে বিরক্ত হয়ে খাটের ওপর উঠে বসলো রতন।

কিন্তু চৌধুরীর মুখ দেখে শিউরে উঠলো সে। তারপর লাফিয়ে খাট থেকে নেমে তার কপালে হাত দিলো। জমাট বরফের মতো ঠাণ্ডা দেহ চৌধুরীর। খোলা চোখ তার, স্থির সে-চোখের মণি! গালে কাল রাত্তিরের চোখের জলের শুকনো দাগ। আর তার দেহের চারপাশ ঘিরে উড়ছে কতকগুলো পোকা। অতো মাছি একসঙ্গে লণ্ডনে কখনো দেখে নি রতন। মশাও নয়। তবে ওগুলো কী পোকা?

রতন জানে না তার নাম।

১২

কিন্তু আবার নতুন করে লণ্ডন ভালো লাগে রতনের। আবার এই পথ, এই ধূলিকণা, লণ্ডনের প্রতি মুখ তাকে ইসারায় বলে, তুমি আমাদের। আমাদের ছেড়ে, লণ্ডন ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি! কতো কি পেয়েছে রতন এখানে তুলনা নেই তার।

একদিন নিঃশব্দে নেমে এলো নতুন তুষার। রতনের চির-চেনা সেই সহস্র ভিজে শেফালি। রিমঝিম রিমঝিম বাজে একটানা মন্থর সুর। সোনা বউ এলো আজ। রতন তার চুলের গন্ধ পায়। পায়ে তার মল। ফিসফিস করে কানে কতো কথা বলে সে। আজও লজ্জা ভাঙে নি তার। এই তুষার এমন করে একদিন সে দেখতে পাবে না সেকথা ভাবতে ভয় হয় রতনের। এতো নির্জনে সোনা বউকে পৃথিবীর আর কোথায় পাবে সে।

নিমেষে নিমেষে রঙ বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর। এতো শুভ্র রেশম এতোদিন কোথায় লুকিয়েছিলো! কতো নেবে সোনা বউ, আঁচল ভরে তুলে নাও আকাশ-ঝরা ভিজে শেফালি, লজ্জা কোরো না, কেউ দেখছে না আমাদের।

তবু সোনা বউ কথা বলে না। গাছের পাতারা নেই। পাখিরা কোথায়! বাসা বেঁধেছে গাছে তুষারের দল। রতনকে দেখলেই তারা চঞ্চল হয়ে ঝরে পড়ে, আর সে শোনে তাদের কলরব। ওরা যেন রতনের শুভ্র পাখির দল। মুঠো ভরে সে তুলে নেয় তাদের, কচি বুকের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়।

আস্তে আস্তে নরম তুষার হাতের মুঠোয় অনুভব করে রতন। এদের ছেড়ে বাঁচবে কেমন করে সে—এদের ছেড়ে যাবে কোথায়!

ভূপাল জাহাজ থেকে চিঠি লিখেছে রটন।

আইলীনের কথায় ধ্যান ভাঙলো রতনের! দরজার কাছ থেকে সরে এসে বললো, তাই নাকি? কী লিখেছে?

কতো কি, সব কথা কি বলতে পারি তোমাকে।

গোপন বুঝি?

হ্যাঁ খুব গোপন, আইলীন কিন্তু চেপে রাখতে পারে না ভূপালের গোপন কথা। বুকভরা উচ্ছ্বাসে একে একে সব খুলে বলে রতনকে। আমি ওর কাছে নেই বলে জাহাজে এতো লম্বা পথ ওর একটুও ভালো লাগছে না, বার বার ঝাঁপ দেবার ইচ্ছে হচ্ছে—

হুঁ, তা সত্যি ঝাঁপ-টাপ দেবে না তো?

ঠাট্টা না বুঝতে পেরে আইলীন বললো, দূর তা কি দেয়? আর লিখেছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, বড়ো ভুল হয়ে গেছে।

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ইণ্ডিয়া যাবার কী দরকার ছিলো? প্যারিস ঘুরে এলেই তো পারতো।

বাঃ, আমার বুঝি ভূপালের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না?

করে নাকি? কিন্তু তোমাকে নিয়ে তো ভূপাল দেশে যাবে না, এখানেই তো থাকবে শুনি বরাবর?

মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবো বৈ কি আমরা। ভূপালের দেশ দেখবো না তা কি হতে পারে!

গরমে খুব কষ্ট হবে যে তোমার ভারতবর্ষে!

শীতের সময় যাবো আমরা। আর যখনই যাই, ভূপালের কষ্ট না হলে আমারও কোনো কষ্ট হবে না।

এতো ভালোবাসো তুমি ভূপালকে?

আইলীন হেসে বলে, ও আমাকে খুব ভালোবাসে। এই দেখো না কতোবার লিখেছে সেকথা। আমার মতো ভালো কাউকে কখনও বাসে নি ভূপাল। এখন দূরে গিয়ে সেকথা আরও ভালো ভাবে বুঝতে পারছে। আর, একটু থেমে বলে আইলীন, জানো রটন, আমিও বুঝতে পারছি—

তোমরা সুখী হও, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে রতন আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কাচে লক্ষ তুষার-কণার ভিড়। রাস্তা দেখা যায় না। পুরু কাচ ভেদ করেও ঘরে ঠাণ্ডা ভাব ভেসে আসছে। আইলীন এসে রতনের পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু রতন বোধহয় বুঝতেই পারলো না কখন সে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

তোমাকে ভূপাল চিঠি লেখে নি রটন?

না, হেসে বললো রতন, আমাকে তো আর তোমার মতো ভালোবাসে না।

দেশে পৌঁছে তোমাকে লিখবে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, হিসেব-পত্র চাইবে তো।

সেই তুষার মাথায় করেও এই প্রথম খদ্দের এলো ইণ্ডিয়া গ্রীলে। আইলীন কি বলতে যাচ্ছিলো রতনকে, কিন্তু খদ্দের দেখে তার কোট ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রতন বললো, গুডমর্নিং স্যার।

গুডমর্নিং, আইলীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রলোক বললো,

নাস্টি ডে—

মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে আইলীন বললো, ইস্ ইন্‌ট্ ইট্।

রতনের চোখের সামনে কিন্তু তখনও তার সোনা বউ।

মাঝে মাঝে অনেক কথা মনে হয় রতনের। কোথায় যাবে সে এদেশ ছেড়ে? একবার গেলে আর তো ফেরা যাবে না। কেমন করে থাকবে সে তার গ্রামে? আর কী করে চালাবে খরচ? এরকম রেস্তোরাঁ তো নেই তার গ্রামে। শহরের কোনো হোটেলে চাকরি নিয়ে খরচ চলবে না তার। বেশি মাইনে কে দেবে তাকে? কী কাজ পাবে সে? ইংরেজী তো জানে না রতন। তার চেয়ে অনেক টাকা করে নিয়ে দেশে গিয়ে যদি একটা ভালো হোটেল খোলা যায়। কিন্তু দেশের লোক এদেশের লোকের মতো এতো বেশি বাইরে খায় না। চলবে কেমন করে তার হোটেলে। কিছুই করবার নেই রতনের। শুধু একবার ভূপালের মতো মাস কয়েকের জন্যে দেশে যাবে সে। সোনা বউকে খুঁজে বের করা চাই। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার চলে আসবে লণ্ডনে। অল্ডগেটে একটা ছোটো ফ্ল্যাটে থাকবে তারা। প্রাণ ভরে দেখবে কতো তুষারের দিন। নতুন চাকরির ভাবনায় ভুগতে হবে না তাকে। ইণ্ডিয়া গ্রীলে তার আয় যা তাতে দুজনের ভালোভাবে চলে যাবে লণ্ডনে। এই তো তার দেশ! কোথায় যাবে রতন এদেশ ছেড়ে! যাদের ছেড়ে এসেছে তাদের সঙ্গে আর তো মিলে-মিশে থাকতে পারবে না রতন।

তবু থেকে থেকে মন কাঁদে। পুজোর ঢাক কানে বাজে, জমিদারবাবুর বাড়িতে যাত্রার রাত্তিরের সেই কোলাহল মনে পড়ে। আর মনে হয় তাদের কুঁড়ে ঘরের কথা। তার মামা-মামী কি

আজও বেঁচে আছে। অনেক চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পায় নি রতন। ম্লেচ্ছর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবার এতোটুকুও ইচ্ছে নেই তাদের। বোধ হয় রতনের চিঠি তারা না ছুঁয়ে কাউকে দিয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলেছে, পড়েও দেখে নি একবার। এখানে এসে মামার নামে টাকাও পাঠিয়েছে রতন অনেকবার, সে-টাকা কিন্তু ফিরে আসে নি আবার। হয়তো গঙ্গাজলে শোধন করে নিয়ে সে-টাকা খরচ করেছে মামা। লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে সাহস হয় নি তার। কাজেই আজ কার কাছে ফিরে যাবে রতন! তাকে চিনতে পারবে কে?

তাই আবার নতুন করে লণ্ডন ভালো লাগে রতনের!

ক্ল্যারার হাত ধরে রতন বললো, এখনও রাগ যায় নি তোমার?

অমন করে আমার হাত ধোরো না রটন্।

চলো ক্ল্যারা একদিন আমার দোকানে খাবে, সারাদিন বসে থাকবে সেখানে, কতো গল্প করবো আমরা দুজন।

দুঃখিত, আমার সময় নেই তোমার সঙ্গে গল্প করবার।

সারাদিন একা একা থাকতে খারাপ লাগে না তোমার?

ঘরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে।

তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ক্ল্যারা।

ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে নয়।

তা হলে ইণ্ডিয়ান বিয়ে করলে কেন?

ভুল করেছি। আর তো উপায় নেই।

উপায় আছে, বিষ্টুকে ছেড়ে আবার তো চলে যেতে পারো তুমি! তোমাদের দেশে তো অমন কতো হয়।

দরকার হলে যাবো বৈকি, রতনের দিকে তাকিয়ে ক্ল্যারা বললো,

পুড়ে মরবো না নিশ্চয়ই।

পুড়ে মরতে হলে সাহস চাই, তোমাদের সে মনের জোর নেই।

দাঁত চেপে ক্ল্যারা শুধু বললো, মনের জোর! আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা ঠিক নাও হতে পারে রটন্। আর একটা কথা জেনে রাখো, তুমি আমাকে যতোখানি ঘৃণা করো, তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করি আমি তোমাকে।

ইংরেজ হয়ে মনের কথা এতো স্পষ্ট করে বোলো না ক্ল্যারা।

ইংরেজ হলেও আমি ইণ্ডিয়ানের বউ।

রতন হেসে বললো, স্বামীকে চেনো নাকি তুমি?

তোমার সঙ্গে এতো কথা আমি বলতে চাই না রতন।

আবার হাসলো রতন, কতোবার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি ক্ল্যারা।

ক্ল্যারাও হেসে বললো, তোমার ওপর আমার এতোটুকুও রাগ নেই রটন্।

তাহলে চলো, একদিন যাই আমরা তুজন?

নিশ্চয়ই যাবো! একটু অপেক্ষা করো, আর কিছুদিন যাক, আমার স্বামী আস্থক, তারপর আমরা তিনজনে মিলে অনেকবার বেড়াতে যাবো।

তাই তো, বিষ্টুর আসবার তো আর খুব বেশি দেরি নেই। বউ নিয়ে দেশে ফিরে যাবে সে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো রতন।

দীনবন্ধু ভয় পেয়েছিলো। এতো ভয় বোধ হয় জীবনে আর কোনোদিনও সে পায় নি।

বেথ্নেল গ্রীন ক্রিমেটোরিয়ামে ইলেক্‌ট্রিকে পুড়ে ছাই হয়ে

গেলো ব্রাহ্মণ চৌধুরীর দেহ। মৃতদেহ চারদিন পড়ে ছিলো অল্ডগেটে। ওরা ভেবে পায় নি কী করবে সেটা নিয়ে। আলি সাহেব টেলিফোন করে চারদিনের দিন মৃতদেহের গতি করে দেয়।

এমনি করেই হঠাৎ যদি শেষ হয়ে যায় দীনবন্ধু! আর কদিনই বা তার আয়ু?

রতন? ওরে রতন রে?

কি দীনদা, হলো কী তোমার?

এবার আমার পালা রে!

পালা? কিসের?

যাবার পালা রে! অল্ডগেট ছেড়ে যেতে হবে।

শঙ্কিত হয়ে রতন বললো, কোথায়? আমেরিকা যাওয়া ঠিক করে ফেললে নাকি?

আমেরিকা নয় রে, ওপরে আঙুল দেখিয়ে দীনবন্ধু বললো, ওপরের দিকে, চৌধুরী যেখানে গেছে সেখানে।

আরে দূর, কী যে বলো! নিশ্বাস ছেড়ে রতন বললো, বেচারা চৌধুরী বড়ো ভালো লোক ছিলো। কতো দুঃখ দিয়েছি আমরা তাকে। দেশে ফিরে যাবার বড়ো ইচ্ছে ছিলো বেচারার!

দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেই কি ফেরা যায় রে!

চলো বিষ্টুর সঙ্গে আমরাও ফিরে যাই দীনদা?

যাবি কোথায় রে রতনা? কী নিয়ে যাবি বল?

রতনের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আবার দীনবন্ধু বললো, টাকা করবার জন্যে এসেছিলাম, রয়েও গেলাম টাকা করবার জন্যে, কিন্তু কী করলাম রে।

ওদের চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে যায়।

ভূপাল দেশে পৌঁছাবার কিছুদিন পর রতনকে সে বাড়ির ঠিকানায় একটা লম্বা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখলো। চিঠিটা বারবার পড়লো রতন, কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারলো না নিজের চোখকে। ভূপাল আর ফিরবে না। হোটেল বিক্রি করে দিতে চায় সে। রতন প্রথম থেকে আর-একবার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলো—

প্রিয় রতন,

ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। জাহাজে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে আরব সাগরে জাহাজ বড়ো দুলিতেছিলো, তাই দিন দু-একের জন্য সামান্য একটু পেটের অসুখ হইয়াছিলো। কলেরা হইতে পারে মনে করিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম পরিবারের সঙ্গে আর দেখা হইল না।

কিন্তু দেশে পৌঁছিয়া বড়ো ভালো লাগিতেছে। এই বয়সে পুত্র-কন্যা-পরিবার ছাড়িয়া আর বিলাত যাইতে পারিব না— উৎসাহ নাই। টাকা রোজগার করিতে গিয়াছিলাম, অনেক রোজগার করিয়াছি। আর অর্থের প্রয়োজন নাই আমার। কলিকাতায় একটি অমনি হোটেল খুলিব ভাবিতেছি।

মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইলেও আমার অনুপস্থিতিতে সংসারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বাড়ি আগাগোড়া নূতন করিয়া সারাইতে হইবে। আত্মীয়-স্বজনেরা আমার পরিবারের নিকট হইতে অনেক টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে। তাই এই বয়সে অসহায় তাহাকে ছাড়িয়া অতো দূর দেশে যাওয়া আমি উচিত মনে করি না। আর পরিবার বড়ো ধরিয়াছে তাহাকে লইয়া কিছুদিন কাশীবাস করিতে হইবে। কাজেই পুনরায় বিলাত পাড়ি না দিয়া

আপাতত কাশী যাওয়া স্থির করিয়াছি। তাই তোমার উপর সমস্ত ভার চাপাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

তোমার হয়তো লণ্ডনে ব্যবসা করিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহা হইলে তুমি ইণ্ডিয়া গ্রীল কিনিয়া লইতে পারো। আমাকে মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা দিলেই চলিবে। আর যদি তুমি নিজে কিনিতে না পারো তাহা হইলে সেই ইটালিয়ান পিটার সাহেবের সহিত দেখা করিবে। দোকানটি কিনিবার জন্য বহুবার সে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করিয়াছিলো। তাহাই ভালো মনে হয়। কেন না তুমি কিস্তিতে টাকা দিয়া কিনিলে আমার অসুবিধা হইবে। থোকে একসঙ্গে সমস্ত টাকা পাইলেই ভালো হয়। বয়স হইয়াছে, কোনদিন মরিয়া যাইবো ঠিক কি!

তুমি পত্রপাঠ পিটার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া ফেলিবে। সে আমাকে দুহাজার পাউণ্ড দাম দিতে চাহিয়াছিলো। বেশি দরাদরি করিবে না, ওই দামেই রাজী হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি গরজ বুঝিয়া কিছু বাড়াইতে পারো তাহা হইলে আমি খুবই খুশী হইবো।

তোমাকে আমি বড়ো বিশ্বাস করি। আশা করি সে-বিশ্বাস ভাঙিবে না। আরও একটি কথা, মার্চ মাসে আমার বোন-পো বিলাত যাইতেছে। আমি তাহাকে লেখাপড়ার জন্য পাঠাইতেছি। রিজেণ্ট পলি-টেকনিকে সে বছরখানেক ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় পড়িবে। আমি আসিবার সময় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম। সে তোমার কাছ হইতে হিসাব-পত্র ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবে। তাহার নাম সুবোধ দত্ত। সে পৌঁছিবার আগেই তুমি পিটারের সঙ্গে পাকা করিয়া রাখো, যেন সে যাওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই

দোকান বিক্রয় হইয়া যায়।

আর বেশি কি লিখিবো। আশা করি কুশলে আছো। প্রতি সপ্তাহের হিসাব আমাকে এয়ার মেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবে। যেন কিছুতেই কোনো সপ্তাহ বাদ না পড়ে। ইতি—

ভূপালচন্দ্র মল্লিক

তাহলে ভূপাল আর ফিরবে না। রতন ভাবলো সে বোধহয় আগে থেকেই ঠিক করেছিলো সে আর ফিরবে না। কথাটা তাকে আগে বলে নি কেন? এখন কী করবে রতন? না, হোটেল কিনে নেবার ক্ষমতা নেই তার, আর অতো ঝামেলা মাথায় নেবার বিদ্যেও নেই। অন্য একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে তাকে। লণ্ডনে ওয়েটারের বড়ো অভাব, চাকরি পেতে বেশি দেরি হবে না তার।

কিন্তু আইলীনকে কী বলবে রতন—কেমন করে আরম্ভ করবে কথা? সে বেচারী যে দিন গুনছে ভূপালের আসার পথ চেয়ে। কেমন করে তার আশা ভেঙে দেবে রতন! আইলীনের নামও করে নি ভূপাল চিঠির কোনো জায়গায়।

ভূপাল আর আসবে না শুনে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে আইলীন। বেচারীর বড়ো সাধ ভূপালের সঙ্গে ঘর বাঁধবার। ভারতবর্ষে যাবার কতো শখ! কেমন করে তার সোনার স্বপ্ন চুরমার করে দেবে রতন?

পরদিন সেই চিঠি পকেটে নিয়ে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এলো সে। কাজ আরম্ভ করলো যথাসময়। খদ্দেরকে করলো যথারীতি পরিবেশন। অনেকবার চেষ্টা করলো ভূপালের কথা আইলীনকে বলবার।

আইলীনকে এ খবর দিতে বুক ভেঙে যাচ্ছিলো রতনের।

তবু ইতস্তত করে একসময় আইলীনকে ডাকলো নির্জনে রতন।

ইয়েস রটন, কী বলছো ?

ভূপালের আর কোনো চিঠি পেয়েছো তুমি ?

না গো, খুশীতে গদগদ হয়ে আইলীন বললো, এই তো সেদিন জাহাজ থেকে অতো বড়ো চিঠি লিখলো। আমি যে উত্তরও দিই নি তার এখনও। আমাকে ও চিঠি লিখতে বারণ করেছে কিনা।

কেন বারণ করলো ?

ওর স্ত্রী চিঠি চুরি করতে পারে বলে। বড়ো নীচ মন কিনা তার !

কিন্তু ভূপাল তোমাকে আর চিঠি লেখে না কেন ?

আমাকে চিঠি লিখতে গেলে ওর মন বড়ো খারাপ হয়ে যাবে, আমার কথা মনে পড়ে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে পারবে না ও।

হঠাৎ সটান বলে ফেললো রতন, ভূপাল যদি আর না ফেরে আইলীন ?

বাজে কথা বোলো না রটন, অতো হিংসে কেন তোমার ওকে ?

ভূপাল আর ফিরবে না আইলীন।

হুঁ ? তোমার মতলবটা কী শুনি ? কী চাও তুমি আমার কাছে ?

হেসে রতন বললো, কিছু না। কিন্তু আমি বলছি আইলীন, ভূপাল আর ফিরবে না।

ভূপালের কথা আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো দেখছি।

হ্যাঁ, বোধহয় জানি। শোনো আইলীন, একবার দেশে যেতে পারলে আর কি কেউ সহজে ফিরে আসে এদেশে ? আর ফেরা

যায় না। দেশে ওর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সংসার—

আর এদেশে রয়েছি আমি, আমার চেয়ে বেশি ভালো ভূপাল আর কাউকে বাসে না রটন।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে রতন বললো, ভূপাল আমাকে চিঠি লিখেছে।

ও, তাই নাকি ?

হ্যাঁ লিখেছে—

কী লিখেছে ?

আস্তে আস্তে পকেট থেকে চিঠি বের করে আইলীনকে দেখিয়ে রতন বললো, লিখেছে আর ফিরবে না, হোটেল বিক্রি করে দিতে চায় ও।

ভূপালের হাতের লেখা দেখে মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে আইলীন বললো, ওমা, এ অক্ষর তো আমি চিনি না।

চিঠিটা ইংরেজী করে পড়ে শোনাবো তোমাকে ?

যদি তুমি চাও—

হেসে রতন বললো, তোমার নামও করে নি কিন্তু।

তোমার চিঠিতে আমার নাম না করলেও ক্ষতি নেই রটন।

আবার হেসে তার অদ্ভুত ইংরেজীতে প্রত্যেকটি লাইন অনুবাদ করে রতন বুঝিয়ে দিলো আইলীনকে। আইলীন কিন্তু বুঝতে পারলো সব কথা। ভূপালের মনের ভাব ভালো করে জানে সে। তাই চিঠি শেষ হতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। রতনের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, তুমি বড়ো বোকা, ভূপালকে একেবারেই বুঝতে পারো না। দেখছো না তার ভাগ্নেকে পাঠাচ্ছে। কেন অত্তো পয়সা খরচ করে তাকে পাঠাচ্ছে সে ? বোকা ! আমাকে

সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কলকাতায় দোকান খোলবার কথা লিখেছে ভূপাল। আমাকে বাদ দিয়ে সে রেস্তোরাঁ চালাতে পারে কখনও?

আইলীনের হাত ধরে রতন বললো, তাহলে আমি পিটারের সঙ্গে দেখা করে এই রেস্তোরাঁ বিক্রি করবার বন্দোবস্ত করি।

নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

কী?

যদি তুমি আমি কোনো রকমে কিস্তির টাকা দিয়ে কিনে দি—যদি আমরা দুজন এটা চালাই—

আবার খিলখিল করে হাসলো আইলীন, তুমি সত্যি বড়ো বোকা রটন। ভূপাল রইলো ইণ্ডিয়ায় আর আমি এখানে থাকবো কেমন করে? তুমি তাড়াতাড়ি পিটারের সঙ্গে কথা বলো। মনে মনে হিসেব করে আইলীন বললো, এটা তো ফেব্রুয়ারি মাস, ভূপালের ভাগ্নে এসে পড়বে মার্চে। সময় বড়ো কম। কোনদিন আমাদের চলে যেতে হয় কে জানে!

আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বললো না রতন।

১৩

তুষার থেমে গেছে। তবু ভারী ঠাণ্ডা এখন লণ্ডনে। থমথম করে চারপাশ। কঙ্কালের মতো নেড়া গাছগুলি দিশাহারা করে রতনকে। শুধু এলোমেলো বাতাসের একটানা হাহাশ্বাস। রতনের আজকাল নিজেকে মনে হয় নিঃসঙ্গ, এই বিদেশে যেন একেবারে একা সে। বার বার তার মনে হয়, সে বিদেশী। এমন কথা আগে কোনোদিনও মনে হয় নি রতনের।

তুষারের সঙ্গে তাকে একা ফেলে চলে গেছে তার সোনা বউ। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করে না রতন। আবার সে আসবে, আবার বাজবে তার পায়ের মল, আর আকাশ থেকে আবার ক্ষণে ক্ষণে ঝরে পড়বে ভিজে শেফালির দল। সোনা বউকে মনের নিবিড়ে চিরদিন ধরে রাখবে রতন।

কিন্তু আর কাউকে তো ধরে রাখতে পারবে না সে। যারা এতোদিন ছিলো তার কাছে কাছে, যারা সুখে-দুঃখে কতোবার ভুলিয়েছে তার প্রবাসের ব্যথা—একে একে তারা সকলেই চলে যাবে একদিন। দীনবন্ধু যাবে, ক্ল্যারা যাবে, চৌধুরী চলে গেছে।

চৌধুরীর কথা মনে হতেই শিউরে ওঠে রতন। অমনি যদি সেও একদিন চলে যায়! ভাবতে ভাবতে সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায় রতনের। ভূপাল অমন চিঠি না লিখলে এতো বিচলিত হতো না সে। স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি রতন যে

এমনি করে লণ্ডনের ব্যবসা তুলে দেবে ভূপাল।

আইলীনও চলে যাবে একদিন! তাকে বড়ো মায়া লাগে রতনের আজকাল। ছোটো মেয়ের মতো অবুঝ আইলীন। কেমন করে রতন তাকে বোঝাবে আজ, যে আর কোনোদিনও ভূপাল তাকে এক লাইনও চিঠি লিখবে না—তার নামও করবে না কারুর কাছে! দেশে গিয়ে নিজের পরিবারের পাশে বসে কে আর মনে রাখে বিদেশের খেলার কথা। তার সোনা বউকে পেলে রতনও কি মনে রাখবে আর কারুর কথা! এসব তো স্বপ্ন হয়ে যাবে একদিন—ধূলি হয়ে যাবে।

প্রথম থেকেই রতন জানতো ভূপাল অমনি করে ফাঁকি দেবে আইলীনকে। কিন্তু এতো শিগগির—একবারও মনে হয় নি। মাঝখানে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো রতনের। বিষ্টু বিয়ে করে সমূলে উপড়ে দিলো তার ধারণা। পুড়ে মরলো দুর্গা। তখন আর একটা মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলো রতন—ভূপালের স্ত্রীর। বিষ্টু যেমন বিয়ে করেছে ক্ল্যারাকে, ঠিক তেমনি করেই এই বয়সে ভূপাল বিয়ে করবে আইলীনকে। সে খবর না দিলেও তার সতী স্ত্রী স্বপ্নে পাবে সে-সংবাদ আর নিজেকে জ্বালিয়ে দেবে কেরোসিনে। তাই অনেক দিন আইলীনের ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলো রতন। বিয়ে হয়েছে জেনেও আবার সে ভূপালকে এমন করে ভালোবাসার অবসর দিলো কেন, কেন দিলো তাকে উৎসাহ? রতন তো ছিলো পাশেই, তার ডাকে সে সাড়া দেয় নি কেন, আজও দেয় না কেন!

কিন্তু ভূপাল ছোটোলোক নয় বিষ্টুর মতো। ভদ্রলোকের ছেলে সে, আর নিজেও ভদ্রলোক। লেখাপড়াও জানে কিছু

কিছু। ভারী মাথা ঠাণ্ডা তার। সব দিক বুঝে কাজ করতে হয় তাকে। এখানে এসেছিলো সে ব্যবসা করতে, টাকা করতে, বিয়ে করতে নয়। লেখাপড়া জানে বলে বোধহয় শেষ অবধি সেকথা মনে ছিলো তার। টাকা করলো, সাধ মিটলো, মাথা ঠাণ্ডা করে দেশের লোক দেশে ফিরলো। আবার বিয়ে করলো না, কাউকে পুড়িয়ে মারলো না। সাবাস ভূপাল!

কিন্তু পর-মুহূর্তেই বিষ্টুকে ভূপালের চেয়ে অনেক ভালো লাগে রতনের। তার স্ত্রী পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আইলীনকে যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে ভূপাল। এই যদি ঠিক করেছিলো তাহলে লেখাপড়া শিখে, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে, এমনি করে একটা মেয়েকে ছলনা করলো কেন সে? আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভূপালকে মনে মনে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে রতনের। আর বিষ্টুকে তার মনে হয় বাহাতুর। ক্ল্যারাকে খুব ভালো লাগে—আইলীনের চেয়েও। আজ বার বার সে এদের সকলকে তুলনা করে দেখে মনে মনে। সব জেনে-শুনেও আইলীন ভালোবেসেছে ভূপালকে। কিন্তু ক্ল্যারা তো জানতো না যে বিষ্টুর বিয়ে হয়েছে। তাই ক্ল্যারাকে আইলীনের চেয়ে বড়ো মনে হয়। বিষ্টু তাকে ঠকিয়েছে বটে কিন্তু ভূপালের মতো পালায় নি। মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের স্ত্রীর কাছে ভূপাল যেমন ফিরে গেলো, বিষ্টুও তো ঠিক তেমনি করেই চলে যেতে পারতো। আইলীনের তুঃখের কথা আজ ভাবতে পারে না রতন, আর ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টুকে তার আগেকার মতোই ভালো লাগে। এতোদিন পরে সে বিষ্টুকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করতে পারলো। আর ভাবলো ক্ল্যারার কাছে আর একবার ভালো করে ক্ষমা চাইবে। সে যদি

এবারও ক্ষমা না করে তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না রতনের।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হু-হু করে ওঠে তার মন। কাকে নিয়ে সে থাকবে লণ্ডনে! এতো বিচলিত সে হতো না, যদি না তাকে ইণ্ডিয়া গ্রীল বিক্রয় করার বন্দোবস্ত করতে হতো। আবার নতুন জায়গায় তাকে চাকরি খুঁজতে হবে—নতুন লোকের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। আর নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে চায় না রতন—অনেক হয়েছে। আর কোন দোকানের মালিক ভূপালের মতো এতোখানি বিশ্বাস করবে তাকে? কথায় কথায় ঝগড়া। নতুন করে চাকরি খোঁজার উৎসাহও নেই। শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিছু ভালো লাগে না আজকাল।

বিষ্টু চলে যাবার পর ও বাড়িটা ছেড়ে দেবে রতন। অতো বড়ো বাড়ির আর দরকার কী? অল্ডগেটেই আর একটা ছোটো ঘর নিয়ে থাকবে সে। হয়তো শুধু দীনবন্ধু লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। কিন্তু ক্ল্যারা চলে গেলে দীনবন্ধুর সঙ্গে আর একদিনও থাকবে না রতন। তাকে অমনে করে টাকা ধার না দিলে এতো-দিনে কতো টাকা জমিয়ে ফেলতে পারতো সে। এ বাড়িতে আর ভালো করে ঘুম হয় না রতনের। কে যেন তার কানের কাছে সারারাত ফুলে ফুলে কাঁদে। চৌধুরীর গলার স্বর চিনতে ভুল হয় না তার। তবু আজও ও-ঘরটা বদলাতে পারে নি সে। অন্তত একটা লোকও যদি তার কান্না না শোনে তাহলে কোনোদিনও সান্ত্বনা পাবে না চৌধুরীর আত্মা—চিরদিন অমনি কেঁদে কেঁদে ফিরবে। তাই শেষ অবধি ঘর বদলাতে পারে নি রতন।

সবাই যদি চলে যায় তাহলে কাকে নিয়ে থাকবে সে! এতো বড়ো বাড়ি আর কিছুতেই রাখা সম্ভব হবে না। অথচ অন্য

কোথাও গিয়ে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে রতনের। শুধু যদি ক্ল্যারা আর বিষ্টু ওর সঙ্গে চিরদিন থাকতো এদেশে। তবে কি রতন চিরকালের জন্য থেকে যাবে এখানে? আর ভাবতে পারে না ও। মাথার শিরাগুলো দপদপ করে, একটা অদ্ভুত আশঙ্কায় ওর সমস্ত শরীর বার-বার হিম হয়ে যায়। কিন্তু কিসের আশঙ্কা সেকথা নিজেই জানে না রতন। শুধু যদি ভূপালের মত বদলায়—শুধু যদি সে আবার ফিরে আসে—তাহলে হয়তো বেঁচে যায় রতন। চিরদিন এদেশে থাকতে হবে মনে করলে থেকে থেকে ভয় করে ওর। কী দরকার ছিলো জাহাজে চাকরি নেবার? কী দরকার ছিলো এদেশে আসার? এখন থাকতেও পারবে না, ফিরতেও পারবে না। ঘুম হয় না রতনের। ছটফট করে সারারাত।

কিন্তু সে-ই বা ফিরতে পারবে না কেন? আর একবার নিজের কথা ভালো করে ভাবতে আরম্ভ করে রতন। ফিরতেই হবে তাকে। যদি দেশে গিয়ে খেতে না পায় তাহলে আবার চলে আসবে লণ্ডনে। কিন্তু দেশে গিয়ে উঠবে কোথায়—খাবে কী? টাকা কোথায়? চেষ্টা করলে বিষ্টুর মতো একটা চাকরি তার কিছুতেই হবে না? কালই সে ভূপালকে একটা চিঠি লিখবে, কলকাতায় দোকানে সে নিশ্চয়ই চাকরি দেবে তাকে। ভাবনায় শরীর টলে রতনের।

একরকম আইলীনের তাগাদায় এর মধ্যেই রতন দেখা করেছে সেই ইটালিয়ান পিটারের সঙ্গে। দেরি সইছে না একদিনও আইলীনের। শিগগিরই এসে পৌঁছবে ভূপালের ভাগ্নে সুবোধ। নামটা একবার শুনেই মনে রেখেছে আইলীন। লেস্টার স্কোয়ারের অমন তৈরী রেস্তোরাঁ এখন কিনতে পাওয়া লণ্ডনের যে-কোনো ব্যবসাদারের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তবু গরজ দেখে পিটার দাম

দিলো এবার দেড় হাজার পাউণ্ড। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় নি আইলীন। কাজেই নিজে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এসে পিটার দু'হাজার পাউণ্ড দাম দেবে বলে গেছে। কিন্তু সুবোধ না আসা অবধি বিক্রি হবে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে পিটারকে। এ কদিন এরাই চালাবে রেস্তোরাঁ। আর সপ্তাহে সপ্তাহে এয়ার মেলে হিসেব পাঠাবে ভূপালকে। ইণ্ডিয়া গ্রীলও উঠে যাবে একদিন। দেরি নেই তার আর। কোথায় যাবে রতন!

লাস্ট টিউবের ভয় আর রতনের নেই। বারোটা বাজবার আগেই তাড়াহুড়ো করে বেরোয় না সে। সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে রাস্তায় নামে। ভূপালের সেই ঘরে আইলীন একাই থাকে আজকাল। তাকে গুড নাইট জানিয়ে মাঝ রাত্তিরে মাঝে মাঝে পিকাডিলির চারপাশে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় রতন। প্রত্যেকটি দোকান বন্ধ। কিন্তু পিকাডিলি যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। রাতের পিকাডিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। লোকের মুখের বাঁধন খুলে গেছে এখন—কোলাহল জেগেছে। ঠোঁটে আর গালে রঙ মেখে এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মেয়ে। রতনকে তারা ইসারা করে, মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, হাত বাড়িয়ে 'হ্যালো' বলে। কিন্তু সে দেখে না তাদের দিকে। মুখ বুজে শুধু ঘুরে বেড়ায়। রিজেণ্ট স্ট্রীট ধরে কিছু দূর এগিয়ে যায়, হে মার্কেটে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তোলে, পলমল ছাড়িয়ে সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের কাছে এসে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। তারপর ইরসের মূর্তির তলায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মূর্তির ওপর। ইরসের হাতে ধনুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তীর খুঁজে পায় না

রতন। তীর কোথায় গেলো ইরসের। এই রাত্তিরে সেই কোলাহল-মুখর লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডে দাঁড়িয়ে বিচ্ছেদের একটা করুণ সুর ক্ষণে ক্ষণে তার কানে বাজে। অথচ কেন এই বেদনা সে কথা সে জানে না। ইরসের মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভয় পায় সে। তার প্রতি রোমকূপ কেঁপে ওঠে।

সাফটস্‌বেরী এভিনিউ ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করে সে। কিন্তু ক্লান্তি সহজে আসে না আজকাল তার। সারা রাত সে এমনি করে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিতে পারে। এতো রাত্তিরে কেমন করে বাড়ি ফিরবে সেকথা ভাবে না রতন। যদি বাস পায় তো উঠে পড়বে! না হলে হেঁটেই ফিরবে। টিউব বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় আধঘণ্টা আগে।

একটা বাস হাত দিয়ে থামিয়ে উঠে পড়ে রতন। বেশি কেউ নেই শুধু দুটো বুড়ি আর একটা বুড়ো বসে ঢুলছে। হবোর্ন অবধি যাবে সে-বাস। হবোর্ন টিউব স্টেশন আসতেই কণ্ডাক্টার জানায়, এখানেই নামতে হবে সকলকে। বাস গ্যারেজে যাবে এবার।

প্রায় চোখ বন্ধ করে চ্যান্সারি লেন ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে রতন। ডানদিকের একটা গলি দিয়ে এসে পড়ে ফ্লীট স্ট্রীটে, তারপর বাঁ দিকে এগিয়ে যায়। অল্ডগেট পৌঁছতে বেশ সময় লাগে তার।

কিন্তু তবুও ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না রতনের। এমনি হেঁটে হেঁটে বাকি রাতটুকুও কাটিয়ে দিতে চায়। আলি সাহেবের বাড়ির সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আলি সাহেব, তার স্ত্রী আর টিপু সুলতান—এদের কথা বার বার মনে পড়ে আজ। কেন মনে পড়ে? তাদের যেন হিংসে হয় রতনের।

এখনে প্রথম আসার পর সেও তো অমনি সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলো। হঠাৎ তার আবার নতুন করে মেম বিয়ে করবার সাধ হয়। হয় তো তাহলে কেটে যাবে এই গ্লানি, মুছে যাবে এই বেদনা, দেশের কথা ভেবে বুক ঠেলে ঝরবে না দীর্ঘশ্বাস। ইণ্ডিয়া গ্রীল উঠে গেলেও আবার নতুন করে চাকরি খোঁজার উৎসাহ পাবে সে।

হঠাৎ চমকে ওঠে রতন। আলি সাহেবের বাড়িব পাশে অমন হাঁ করে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিসের সন্দেহ হয়। আস্তে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে পুলিস বলে যে, যদি রতন দয়া কবে তার আইডেনটিটি কার্ড দেখায় তাহলে বাধিত হবে সে। টর্চ জ্বেলে সেটা দেখে সন্দেহ দূর হয় পুলিশের। তখন সে রতনকে দেয় উপদেশ, এমন করে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধরে যাবে তার। ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করে রতন। সেই পুলিস শেষ অবধি তাকিয়ে থাকে তার দিকে, লক্ষ্য রাখে কোন বাড়িতে ঢোকে সে।

ঘরে ঢুকতেই সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠলো রতনের। তার খাটে দীনবন্ধু শুয়ে আছে আর বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে মেঝে। মদের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। ভয়ঙ্কর রাগে জ্বলে উঠলো রতন। কাঁপতে কাঁপতে কোনো রকমে দূরে ছুঁড়ে ফেললো ওভারকোট। তারপর দীনবন্ধুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো, ব্লাডি সোয়াইন্ বাস্টার্ড। দীনবন্ধুর দুই কাঁধ ধরে সে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকানি দিতে লাগলো!

কে বাবা? ইওর ফাদার বাস্টার্ড, চোখ খুলে রতনকে দেখে দীনবন্ধু বললো, এই রাত্তিরে কোথা থেকে কী টেনে এলি রে? বলি

দাপট দেখানো হচ্ছে ?

তখনও দীনবন্ধুকে সমানে ঝাঁকানি দিতে দিতে রতন বলে চলেছে, এখুনি তোমাকে বমি পরিষ্কার করতে হবে—

তোর্ বাপের চাকর আমি ? এক ধাক্কায় দীনবন্ধু রতনকে অনেক দূরে ঠেলে দিলো। কিন্তু রতন আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না। দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

আমার ঘরে কেন এসেছো তুমি ?

চোখ পিটপিট করে দীনবন্ধু বললো, ভালো করে জিজ্ঞেস কর, উত্তর দিচ্ছি। অতো চোটপাট কিসের রে ? বলি তুই জোরে আমার সঙ্গে পারবি রে ?

ক্ল্যারা বাড়িতে, এমন করে মদ খেয়ে বমি করতে লজ্জা করে না তোমার ?

উঃ আমাকে আদব কায়দা শেখাচ্ছে রে। বলি কে কোথায় আছো গো শোনো ! এখানে কে মদ না খায় আর কে বমি না করে ? বলি তুই কি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নাকি ?

গোলমাল শুনে ক্ল্যারার ঘুম ভেঙে গেলো। ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলো সে। দরজা খুললো রতন।

কী ব্যাপার ? একি, বমি করেছো নাকি রতন ?

আমি মদ খেয়ে কখনও বমি করি না। কিন্তু ও যদি এখুনি বমি পরিষ্কার না করে তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো আমি।

ও বাবা, এতো রাগ তোমার ! আমি ভেতরে আসতে পারি কি ?

এসো ক্ল্যারা, দীনবন্ধু নালিশ জানালো, দেখো, একটু ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম, আমার ঘুম ভাঙিয়ে রতন বলে কিনা এখুনি ঘর পরিষ্কার করতে হবে।

আমি এ ঘরে ঘুমোতে পারবো না। সারাদিন খেটে খুটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসি-—

রতনের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলো ক্ল্যারা। মিনিট কয়েক পরে একটা ঝাঁটা আর অনেক খবরের কাগজ নিয়ে ফিরে এসে বললো, সরো সরো, গোলমাল করতে হবে না তোমাদের। নিজেই সে লেগে গেলো দীনবন্ধুর বমি পরিষ্কার করতে।

কী করছো ক্ল্যারা, তাকে বাধা দিয়ে রতন বললো, তোমাকে তো পরিষ্কার করতে বলি নি আমি।

কিছু যায় আসে না, ক্ল্যারা হেসে বললো, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো গোলমাল করে কেউ? আমি ভাবলাম আগুন লেগেছে বুঝি বাড়িতে।

রতন ডাকলো, দীনবন্ধু? কিন্তু সাড়া দিলো না কেউ। সে বোধ হয় তখন নাক ডাকিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

সরো ক্ল্যারা, আমি পরিষ্কার করবো।

কোনো দরকার নেই, হয়ে গেছে প্রায়। এই রাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তো আমার! রতনের দিকে তাকিয়ে ক্ল্যারা বললো, মাতালদের আমার খুব ভালো লাগে, জানো রতন?

তাই নাকি? তুমি মাতাল হও ক্ল্যারা?

না আমি মদ খাই না।

তাই তো ক্ল্যারাকে এতো ভালো লাগে রতনের।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও

দীনবন্ধুর ওপর রাগ যায় নি রতনের। এতো ঘর থাকতে লোকটা আজ ওর ঘরেই বা এসেছে কেন কে জানে।

নাও সব ঠিক, দীনবন্ধুর দিকে তাকিয়ে ক্ল্যারা বললো, ওকে আর জাগিও না যেন, মাতাল হয়েছে বেচারা—তুমি চৌধুরীর খাটে শান্ত ছেলের মতো শুয়ে পড়ো এবার।

না, ও খাটে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারব না।

কেন?

ভয় করবে আমার।

ক্ল্যারা হাসলো, তুমি একটি ছোট্ট ছেলে। তবে যাও দীনবন্ধুর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। এমন করে রাত্তির জাগলে কাল কাজে যাবে কেমন করে? দেখছো না ভোর হয়ে এলো—

ক্ল্যারা চলে এলো নিজের ঘরে। রতন তার ঘরের দরজা বন্ধ করবার শব্দ পেলো। কিন্তু ঘুম নেই রতনের চোখে। কয়েক মিনিট সেই ঘরে ঠিক তেমনি করেই দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর এসে ধাক্কা দিলো ক্ল্যারার ঘরে।

কে?

আমি রতন।

দরজা খুলে ক্ল্যারা বললো, আমাকে কি একটু ঘুমোতে দেবে না তোমরা আজ?

না, অনেক তো ঘুমিয়েছো, হাসতে হাসতে ক্ল্যারার ঘরে ঢুকে রতন বললো, আমি গল্প করতে এলাম তোমার সঙ্গে।

কিন্তু আমি দুঃখিত, এটা গল্প করবার সময় নয় রটন।

ঘুম পায় নি আমার একটুও।

আমার কিন্তু ঘুম পেয়েছে, খাটের ওপর বসে ক্ল্যারা 'ছোটো

হাই তুললো।

তাহলে ঘুমোও তুমি, রতন হঠাৎ ধপ করে তার পাশে বসে পড়ে পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে বললো, একটা সিগ্রেট খাও।

আমি সিগ্রেট খাই না।

ও, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ একটা খাও।

না, ধন্যবাদ।

ক্ল্যারার ঘরে ছাইদান নেই। রতন এদিক ওদিক তাকিয়ে যখন ভাবছে কোথায় ছাই ফেলবে, তখন ক্ল্যারা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে একটা খালি সিগারেটের টিন এনে তার সামনে রাখলো। কিন্তু ঠিক তেমনি করেই আবার এসে বসলো তার পাশে।

একটা সুখবর আছে রতন।

সুখবব ? কি সুখবর ক্ল্যারা ?

আর সাত-আট দিনের মধ্যেই বিষ্টু এসে পড়বে যে।

বিষ্টু ? সাত-আট দিনের মধ্যে ? কেমন করে জানলে তুমি ?

চিঠি লিখেছে আমাকে।

ক্ল্যারা রসিকতা করছে মনে করে রতন হেসে বললো, দেখি চিঠি ?

ক্ল্যারা উঠে ড্রয়ার খুলে চিঠি বের করে রতনের হাতে দিয়ে বললো, দেখো।

বিষ্টুর হাতের লেখা রতন চেনে। চিঠি দেখেই টনটন করে উঠলো তার বুক। বললো, কী লিখেছে ? ইংরাজীতে লিখেছে নাকি ?

হ্যাঁ, ক্ল্যারা হেসে বললো, তুমি বলো বিষ্টু ইংরেজী লিখতে জানে

না—পড়ো না এই চিঠিটা।

পড়বো ?

রতন সত্যি চিঠি খুলে পড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার বেশির ভাগই দুর্বোধ্য ঠেকলো তার কাছে। এমন ইংরেজী বিষ্টু লিখলো কেমন করে ? মেম বিয়ে করলে লোকে রাতারাতি ইংরেজী শিখে যায় নাকি ? কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলো রতন। জাহাজে কোনো ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে বিষ্টু চিঠিটা লিখিয়েছে· তারপর ধরে ধরে নিজের হাতে লিখে সেটা পাঠিয়েছে ক্ল্যারার কাছে।

হুঁ ? চিঠিটা ক্ল্যারাকে ফিরিয়ে দিয়ে রতন বললো, সত্যি তাহলে এতো তাড়াতাড়ি বিষ্টু আসছে !

সে যে চিঠির অনেক অংশ বুঝতে পারে নি সেকথা তাকে বলতে আজ বড়ো লজ্জা হলো রতনের। একবার ইচ্ছে হলো বিষ্টুর বাহাদুরির কথাটা ভেঙে দেয় ক্ল্যারার কাছে। কিন্তু তাও পারলো না শেষ অবধি। হাত দিয়ে কপালে উড়ে আসা চুল সরিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে বলে তোমার ভালো লাগছে না রটন্ ? অন্যমনস্ক হয়ে রতন উত্তর দিলো, না।

স্বাভাবিক, ক্ল্যারা বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, আমি চলে গেলে তোমাদের অসুবিধার কথাটা ভাবছো, না ?

অসুবিধার কথা নয়, তুমি চলে যাবে তাই ভাবছি।

খুব জোরে হেসে ক্ল্যারা বললো, এতো দরদ !

ক্ল্যারা, একটু ইতস্তত করে রতন বললো, তোমার সঙ্গে আমার আগে দেখা হলো না কেন ?

একথা বলছো কেন ?

তাহলে, হঠাৎ ক্ল্যারাকে কাছে টেনে নিয়ে রতন বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম।

রটন্! নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ক্ল্যারা বললো, কী বলছো তুমি ? তুমিও কি মদ খেয়ে এসেছো নাকি ?

না।

তাহলে এসব কথা আমাকে বলবার মানে কী ?

আজ রাত্তিরে আমার সাহস বড়ো বেশি বেড়ে গেছে ক্ল্যারা।

কিন্তু বিষ্টুর আগে যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো তাহলে যে আমি তোমাকে বিয়ে করতাম সেকথাই বা তুমি ভাবতে পারো কেমন করে ?

ক্ল্যারা, এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি ? রতন আবার কাছে টেনে নিলো তাকে, তোমাকে ছেড়ে সত্যি আমি থাকতে পারবো না—

তাকে ঠেলা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে ক্ল্যারা শুধু বললো, রটন্! এই রাত্তিরে কেউ কোথাও নেই, শুধু তুমি আর আমি।—আবার ক্ল্যারার কাছে এগিয়ে এলো রতন।

রটন, আমি ইংরেজ—

তাতে কি ক্ল্যারা ?

পুড়ে মরতে পারি না, কিন্তু স্বামীর বিশ্বাস রাখতে জানি।

ক্ল্যারা তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।

হ্যাঁ, দরকার হলে হতে পারি বৈকি।

ক্ল্যারা আর কোনো কথা বললো না। রতনও চুপ হয়ে গেলো তার কথা শুনে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

তোমার কোনো ভয় নেই ক্ল্যারা।

ভয়! আমি কাউকে ভয় করি না।

আমাকে আজ তোমার ভয় করছে না?

দাঁতে দাঁতে চেপে ক্ল্যারা শুধু বললো, আই হেট ইউ রটন্।

এরপর রতন আর কিছু বলতে পারলো না, একেবারে চুপ করে রইলো। টেবিলের ওপর ক্ল্যারার ঘড়িতে দেখলো ভোর চারটে বেজেছে। আস্তে আস্তে বালিশে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো। আর ক্ল্যারার খাটে শুয়ে আজ ভোর রাত্তিরে বার বার তার মনে হলো, যখন দিশাহারা ক্ষুধার্ত মন নিয়ে সমস্ত লণ্ডন চষে বেড়িয়েছে তখন এমন একটি মেয়ের সঙ্গে কেন তার দেখা হলো না।

রতনকে তার খাটে শুয়ে পড়তে দেখে ক্ল্যারা কোনো কথা বললো না, কিন্তু নিজে উঠে গিয়ে বসলো সামনের চেয়ারে। তখনও বোধ হয় রাগ যায়নি তার, তাই কথা বলবার প্রবৃত্তি ছিলো না। তবু পাছে রতন তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, ভয় হলো ক্ল্যারার।

রটন্? প্রথমে আস্তে ডাকলো সে, রটন্? তারপর আরও জোরে, রটন্—

কোনো উত্তর নেই। খুব সাবধানে আবার সে এসে বসলো খাটে। ঘুমিয়ে পড়েছে রতন। তিনটে কম্বল তার গায়ে একসঙ্গে চাপা দিলো ক্ল্যারা। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সত্যি রতনকে তার মনে হলো ছোট্ট একটি ছেলে। মুখ নামিয়ে সে প্রায় তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। সভয়ে তাকিয়ে দেখলো চারপাশ—না কেউ দেখছে না তাকে। তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলো ক্ল্যারা। তারপর আলো নিবিয়ে ড্রেসিং-গাউন গায়ে সেই চেয়ারে বসে রইলো সারারাত।

পরের দিনও বাড়ি ফিরে রতন দেখলো ঠিক তেমনি করে দীনবন্ধু তার বিছানায় বসে আছে। কিন্তু আজ রতন আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সে।

রোজ রোজ আমার ঘরে কি চাও তুমি ?

রাগ পড়লো রে রতনা ? আরে আমরা দুটো এখানকার পুরোনো পাপী, আমরা কামড়া-কামড়ি করলে চলে রে ?

এই কথাটা এতো রাত্তিরে না বললে কি চলত না ?

দিনের বেলায় তোর দেখা পাবো কোথায় রে ? তুই তো রাতের মানুষ। শোন, এবার একটা ঘর-টর দেখে নে তুই !

ঘর ?

হ্যাঁ রে ঘর। বলি বিশ্বাস তো করবি না আমাকে—কিন্তু সব ঠিক করে ফেললাম রে এবার। আর দশদিন পর এতোক্ষণে আমি সে—আমেরিকার জাহাজে।

সত্যি তুমি এই বয়সে আমেরিকা যাচ্ছো দীনদা ?

হ্যাঁ রে। বয়স আবার কি ? বলি বিলেতে পঁয়তাল্লিশ বছর আবার একটা বয়স নাকি রে ? আর যাচ্ছি, বুঝলি রতনা, গবর্নমেণ্টের পয়সায়। সেখানেও মেসেঞ্জার। এ আপিস থেকে ধর-পাকড় করে বদলী নিলাম। সেখানে গিয়েই ব্যবসা ফাঁদবো। এদেশে কি কিছু হয় রে !

না, সত্যি এদেশে কিছু হয় না দীনদা।

আরে এই খবর পেয়ে কাল একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তোকে বলবো বলে তোর খাটে শুয়েছিলাম—তা তুই এসে তো দড়াম দড়াম পিটতে শুরু করলি।

আমি জানতাম না তুমি এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবে।

যাবো না তো কি এখানে চৌধুরীর মতো মরবো রে? সে-আমেরিকার থেকে টাকার বস্তা নিয়ে হাতিতে চড়ে গুটিগুটি একসময় দেশে ফিরবো। আসার সময় বউকে কথা দিয়ে এসেছিলাম অনেক টাকা নিয়ে আসবো—তাই তো বউ আসতে দিলে। আর, রতনের পিঠ চাপড়ে দীনবন্ধু বললো, বুঝলি রে রতন, মেয়ের বাজার সে-আমেরিকা—

রতন জানে দীনবন্ধু আমেরিকায় গিয়ে কী করবে। লণ্ডনে যেমন করে কাটিয়ে গেলো সেখানেও ঠিক্ তেমনি করেই কাটাবে। তারপর হয়তো একদিন চৌধুরীর মতো শেষ হয়ে যাবে। তবু শেষ অবধি আশা রাখবে দীনবন্ধু, ব্যবসা করে অনেক টাকা সে করবেই —তারপর একদিন খুশিমতো দেশে ফিরবে।

তাই বলছিলাম রে রতনা, উঠে দাঁড়িয়ে দীনবন্ধু বললো, একটা ঘর-টর দেখে নে। ক্ল্যারা বিষ্টু চলে গেলে—

এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে দীনদা?

বলি এতো বড়ো বাড়ি নিয়ে কি বাপের বিয়ে দিবি রে? হাই তুলতে তুলতে দীনবন্ধু নিজের ঘরে চলে গেলো।

দীনবন্ধুও চলে যাবে অবশেষে। দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে যাবে এ বাড়ি। বিষ্টু এসে পড়লো বলে। ক্ল্যারাকে নিয়ে সে দেশে ফিরে যাবে। এই লণ্ডনে কে আর কার পথ চেয়ে বসে থাকবে?

তবু এ বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে জমা কতো মানুষের স্মৃতি, চৌধুরীর কতো বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস, তার নিজের কতো হাসি-কান্নার ইতিহাস!

এ বাড়ি কেমন করে ছেড়ে যাবে রতন!

১৪

দীনবন্ধু আমেরিকা যাবার দিন তিন-চার পর মাল-পত্র নিয়ে বিষ্টু এসে হাজির হলো। এতো আগে তার ইংল্যাণ্ডে আসবার কথা ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেলো। অন্য নতুন জাহাজে সে বদলী হলো। সে-জাহাজ আসছিলো ইংল্যাণ্ডে।

রবিবার দুপুর বেলা বিষ্টু এসে পৌঁছলো অল্ডগেটে। সঙ্গে এবার তার আর কেউ নেই, শুধু দুটো বড়ো সুটকেশ। রতন বাড়িতে ছিলো, ঘণ্টা শুনে নিচে গিয়ে বিষ্টুকে সাহায্য করলো ট্যাক্সি থেকে বাক্স নামাতে। ওরা দুজনে ধরাধরি করে সেগুলো নিয়ে এলো দোতালায়।

ক্ল্যারার ঘরে ধাক্কা মেরে রতন বললো, শিগগির বাইরে এসো, কে এসেছে দেখে যাও। ক্ল্যারা বাইরে এসে বিষ্টুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, হ্যালো ডার্লিং !

হেলো হেলো, বিষ্টু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো ?

খুব ভালো—তুমি ?

তাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে রতন সরে গেলো। ক্ল্যারা বিষ্টুকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। চারদিক তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো বিষ্টু। ঝকঝকে তকতকে ঘর। ময়লা

নেই, দুর্গন্ধ নেই কোথাও, এতোটুকু গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। লোকগুলো গেলো কোথায়!

আজ ক্লারার সামনে বিষ্টু যেন বেশ লজ্জা পেলো। তার মনে হলো যেন এইমাত্র তাদের বিয়ে হয়েছে। ক্লারার শরীর আরও ভালো হয়েছে—আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে সে। সেই কথাই ভাবছিলো বিষ্টু। এই বউ নিয়ে সে যখন বোম্বাই-এর রাস্তায় বেরোবে তখন লোকগুলো অবাক হয়ে দেখবে তার দিকে। কিন্তু তবু ক্লারার কাছে সব সময় বিষ্টু অস্বস্তি বোধ করে। জাহাজে-জাহাজেই বেশি থাকতে হয়েছে তাকে, ইংরেজী বলার দরকার বড়ো একটা হয় নি তার। তাই আজও ইংরেজী বলতে বিষ্টুর বেধে যায়। ক্লারা কি বলে না বলে তার আদ্ধেক কথা বুঝতে পারে না সে, আর নিজে অনেক কথা বলতে চাইলেও প্রকাশ করতে পারে না—যা বলতে চায় তার কিছুই বলা হয় না। তাই ক্লারার কাছে নিজেকে বড়ো নিচু মনে হয় তার। ক্লারা যখন তাকে উচ্ছ্বাসভরা কথা বলে তখন তার এক বর্ণও না বুঝে বিষ্টু শুধু হাসে। উত্তরে কী বলতে হবে ভেবে পায় না। আজ প্রথমেই ক্লারা জিজ্ঞেস করলো, অতো ভালো ইংরেজী লিখতে পারো যখন, তখন কেন আমাকে আরো বেশি চিঠি লেখো নি?

এর উত্তরে বিষ্টু বলতে চেয়েছিলো যে জাহাজে চিঠি লেখবার সময় সে বেশি পায় নি। সব সময় ক্লারার কথা তার মনে পড়েছিলো কিন্তু তাকে ছোটো চিঠি লিখতে তার ইচ্ছে করে নি আর বড়ো চিঠি লেখবার সময় পায় নি। তাই লিখবো লিখবো করেও শেষ অবধি আর লেখা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এতো কথা ইংরেজীতে বলতে গিয়ে বিষ্টু কী যে বললো নিজেই বুঝতে

পারলো না। ক্ল্যারা ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এই রকম প্রত্যেকবারই হয়। তাই ক্ল্যারার কাছে সব সময় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে বিষ্টু। ক্ল্যারাও তার কথা ভালো বুঝতে পারে না। তবু দুজনে দুজনকে ভালোবাসে। ক্ল্যারা তবু নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে দেয় বিষ্টুকে। কিন্তু তাকে কিছু বলতে না পেরে অশান্তিতে বিষ্টুর বুক ভরে যায়। ক্ল্যারা যদি বাঙলা জানতো তাহলে বিষ্টু তাকে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারতো যে সে তাকে কতো ভালোবাসে।

বোধহয় বিষ্টুর মনের কথা বুঝতে পেরে ক্ল্যারা বললো, তোমাদের ভাষা শিখতে কতোদিন সময় লাগে ?

একথা শুনে আরও লজ্জা পেলো বিষ্টু। তার মনে হলো ক্ল্যারার কাছে সে যেন ধরা পড়ে গেছে। থেমে থেমে সে বললো, আচ্ছা ভালো। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একথা বিষ্টু কেন বললো তা না বুঝে ক্ল্যারা তার ঘাড়ে মাথা দিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বিষ্টু ভাবছিলো অন্য কথা। সে ভাবছিলো দেশে নিয়ে গিয়ে ক্ল্যারাকে রাখবে কোথায় ? তার দেশ যদি ক্ল্যারার ভালো না লাগে ? বিষ্টুকে হাতে খেতে দেখে সে হয়তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। মাটিতে বসে তার স্ত্রী খাবে কেমন করে ? গরমে সে যখন খালি গায়ে হাঁসফাঁস করবে তখন কী ভাববে ক্ল্যারা ? এখানে তবু ততো ভাবনা হয় না বিষ্টুর। ক্ল্যারা ভাবে বিষ্টু বিদেশী তাই ইংরেজী না জানা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে গিয়ে সে যখন দেখবে অনেকেই বিষ্টুর চেয়ে ভালো ইংরেজী বলে তখন তার কী ধারণা হবে স্বামীর ওপর! কোনো ভালো হোটেলে স্ত্রীকে

নিয়ে সে যেতে পারবে না। গরমে শীতের দেশে বেড়াতে যাবার কথাও ভাবতে পারবে না। ক্লারার হাত ধরে তাকে রাস্তায় বেড়াতে দেখলে হাসাহাসি করবে সকলে! সেই দারিদ্র্যের মধ্যে ক্লারাকে নিয়ে গিয়ে কী লাভ! অন্য লোকের সামনে সে যখন স্ত্রীর সঙ্গে ভুল ইংরেজীতে কথা বলবে তখন লজ্জার সীমা থাকবে না তার। দেশের অনেকেই মেম বিয়ে করতে চায়। হয়তো কোনো লেখাপড়া-জানা লোকের দেখা পেয়ে ক্লারা তাকে একদিন ছেড়ে যাবে। তখন বন্ধু-বান্ধবের সামনে বিষ্টু মুখ দেখাবে কেমন করে? দেশে গিয়ে ক্লারা তাকে কতো ছোটো করে দেখবে সেকথা ভেবে মন-মরা হয়ে বিষ্টু বসে রইলো স্ত্রীর পাশে। প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলো না। এতো তাড়াতাড়ি দেশে চাকরি নেয়া উচিত হয় নি তার। তার চেয়ে এদেশে থেকে গেলেই পারতো। রতনের মতো একটা চাকরি সে অনায়াসেই পেতে পারতো। দেশের যে বন্ধু-বান্ধবরা এদেশে আসে নি তাদের সঙ্গে আর মিশতে পারবে না বিষ্টু। মেম বউ নিয়ে কাকে দেখাবে সে! কে কথা বলতে পারবে ক্লারার সঙ্গে! তখন অসহিষ্ণু হয়ে ক্লারাই খুঁজে নেবে সঙ্গী, আর ছেড়ে যাবে বিষ্টুকে। চাকরি নিয়ে কিংবা ব্যবসার বন্দোবস্ত করে এদেশে থেকে গেলেই সব চেয়ে ভালো হতো। মাঝে না হয় ক্লারাকে কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতো। সেই শীতেও বিষ্টুর হঠাৎ যেন গরম মনে হলো। এ বিষয় ভালো করে আজই রতনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ক্লারা বাঙালী হলো না কেন! যখন দূরে থাকে তখন মেম বিয়ে করেছে বলে গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে, সারাদিন ভাবে স্ত্রীর কথা। নিজের বাহাদুরির কথা মনে করে নিজেকেই নিজে বাহবা দেয়

বন্ধু-বান্ধবকে বলে ক্ল্যারার কতো গল্প। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এলেই ঝিমিয়ে যায় সে, মনে হয় তারা যেন হাজার যোজন দূরের মানুষ। পৃথিবীর সব মানুষের ভাষা এক হলো না কেন! কতো কথা যে বিষ্টু বলতে চায় ক্ল্যারাকে কিন্তু ভাষার প্রাচীর পদে পদে বাধা দেয়।

চুপ করে আছো কেন? এতোদিন পর আমাকে দেখে তুমি খুশি হও নি?

হেঁ হেঁ আমি খুব খুশি হয়েছি—

তবে চুপ করে আছো কেন?

কিছু ভাবছি।

কী ভাবছো?

মাথা চুলকে বিষ্টু বললো, আমাদের দেশ তোমার ভালো লাগবে না।

আমি জানি আমার খুব ভালো লাগবে।

কিন্তু বড়ো গরম সেখানে। আমি গরিব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। ক্ল্যারা, তুমি আমাকে ইংরেজী শেখাবে?

এই কথা ভাবছো তুমি? ক্ল্যারা হেসে বললো, গরম আমার খুব ভালো লাগে। আর আমিও গরিব। কিন্তু ইংরেজী আমি তোমাকে শেখাবো না। তোমার দেশে যাচ্ছি তাই আমি তোমার ভাষা শিখে নেবো।

সত্যি?

আমি কখনও মিথ্যা বলি না।

কিন্তু আমাদের দেশে যদি থাকতে না পারো?

কেন পারবো না?

হেঁ হেঁ মানে—

তুমি থাকতে পারলে আমি পারবো না কেন ?

ক্ল্যারাকে কাছে টেনে বিষ্টু বললো, তোমাকে কতো ভালোবাসি, কতো কথা বলতে চাই, কিন্তু আমি ইংরেজীতে কিছু বলতে পারি না ক্ল্যারা—

বেশ বলতে পারো। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি।

বিষ্টু আর কিছু বলতে পারলো না। অনেকক্ষণ ক্ল্যারাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইলো। তারপর এক সময় উঠে আর সকলের খবর নিতে গেলো রতনের ঘরে।

রতনের মুখে সবই শুনলো বিষ্টু একে একে। দীনবন্ধু চলে গেছে, চৌধুরী নেই আর। এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাবার চেষ্টা করছে রতন। পারলে হয়তো এ বাড়ি সে রাখতো, কিন্তু অতো পয়সা নেই তার।

তুই কি বরাবর এখানে থেকে যাবি রতন ?

এখনও ঠিক করি নাই কিছু।

এবার একটা বিয়া কর, যা রোজগার করিস তাতে এদেশে থাকলে সুখে চলে যাবে দুজনের।

ক্ল্যারার মতো একটা মেয়ে দেখে দাও না ?

বলি নাই তোরে আমি, খুশী হয়ে বিষ্টু বললো, যে অমন ভালো মেয়ে তুই পাবি না কোথাও ?

সত্যি বিষ্টুদা, তোমার বউ-এর মতো ভালো মেয়ে আর দুনিয়ায় নাই।

ঠাট্টা করিস নাকি রে রতনা ?

না বিষ্টুদা, বুকে হাত দিয়ে বলছি, তোমার ভাগ্য এতো ভালো যে আমার হিংসা হয়।

দেখলি দেখলি, বলিস তো সেকথা! আরে বিয়া কি আমি শুধু শুধু করলাম রে? দেশ ঢুঁড়ে ফেললেও অমন মেয়ে তুই পাবি না কোথাও।

কতোদিন থাকবে তোমরা?

দিন কুড়ি। বড়ো তাড়াতাড়ি আমার। জাহাজ থেকে নেমেই আপিস যেতে হবে।

এই অল্প সময়ে ক্ল্যারার জন্যে জাহাজ পাবে কি?

বিষ্টু হেসে বললো, ওরে আমরা জাহাজের লোক, ওসবে কি আমাদের আটকায় রে? ক্যাপ্টেন সাহেব সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তোমরা চলে যাবে?

হ্যাঁ রে, তুইও চল না আমাদের সঙ্গে।

রতন হেসে একটা সিগ্রেট ধরালো। বিষ্টুর কথার কোনো উত্তর দিলো না। শিগগির একটা ঘর খুঁজে না পেলে চলবে না তার। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ঘর পাওয়া খুব সহজ হবে না হয়তো। অনেক বিদেশী এসে জুটেছে এখন অল্ডগেটে। কোথায় যাবে রতন!

মার্চের শেষের দিকে গরম পড়লো বেশ। আজকাল রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। খোলা না রাখলে গরম লাগে। তবু ওভার-কোট তুলে রাখে নি লণ্ডনের লোক—হাতে ঝুলিয়ে বেড়ায়। তারা জানে আবার যে-কোনো সময় কনকনে ঠাণ্ডা পড়তে পারে। এখন যদিও ঠাণ্ডা নেই কিন্তু হাওয়ার খুব জোর। এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তায় বেরোলেই মাথার চুলগুলি বিব্রত হয়ে পড়ে।

তবুও মার্চের শেষে গরম লণ্ডনে এতো অস্বাভাবিক যে লোকে গবেষণা করে কেন এমন হলো হঠাৎ, আর উচ্ছ্বসিত হয়েই সেই গরম দিনগুলি আনন্দমুখর করে তোলবার চেষ্টা করে।

এমনি একদিনে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এসে উপস্থিত হলো ভূপালের ভাগ্নে সুবোধ। উঠেছে সে রাসেল্ স্কোয়ারের কোনো বোর্ডিং হাউস-এ। ভূপাল তাকে ঠিকানা দিয়ে বলে দিয়েছিলো, ও পাড়াতেই ছাত্রদের বাসা—সেখানেই থাকবি। আড্ডা-টাড্ডা দিবি না বেশি। একটু এদিক-ওদিক করলেই টাকা বন্ধ করে দেবো আমি। যেদিন পৌঁছবি সেদিনই দেখা করবি রতনের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি হোটেল বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিবি আমাকে—তা না হলে তোকে টাকা পাঠানো মুশকিল হবে আমার পক্ষে। আর ওই হোটেল বিক্রির টাকাতেই কলকাতায় রেস্তোরাঁ খুলবো আমি। কাজেই চটপট করবি—বুঝলি ?

সুবোধ ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলো যে সে বুঝেছে। ভূপাল রতনের নামে একটা লম্বা চিঠি দিয়েছিলো তার হাতে। সুবোধের বেশ উৎসাহ ছিলো গ্রীল বিক্রির ব্যাপারে। কেন না মামাকে সে ভালো করেই চেনে, দুম্ করে হঠাৎ টাকা বন্ধ করে দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় একেবারে।

অবশ্য যেদিন সে পৌঁছেছিলো সেদিন রতনের সঙ্গে দেখা করবার কথা ভাবতেই পারে নি সুবোধ। দেখা করলো দিন দশ-বারো পরে। ইণ্ডিয়া গ্রীল খুঁজে পেতে খুব দেরি হলো না তার। ভারতীয় মাত্রেই তার মামার দোকানের নাম জানে। বিকেল বেলা সুবোধ এসে ইণ্ডিয়া গ্রীলে ঢুকলো। আইলীন কাউণ্টারে বসে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো। আর কোনো লোক নেই

এখন রেস্তোরাঁয়। সুবোধ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। তাকে দেখে ধড়মড় করে দাঁড়ালো রতন।

আপনিই কি রতন বাবু?

হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি?

আমার নাম সুবোধ, ভূপালবাবুর ভাগ্নে।

তার নাম শুনেই হিসেব-নিকেশ মাথায় তুলে আইলীন ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়ালো, আমি দেখেই চিনেছি, একেবারে মামার মতো দেখতে—

কিন্তু রতন ভেবে পেলো না সুবোধকে কেমন করে বললো আইলীন যে সে অবিকল ভূপালের মতো দেখতে। খাতির করে এরা দুজন তাকে বসতে বললো, তারপর চা আর নানারকম দিশি খাবার নিয়ে এলো তার সামনে। কিন্তু ভূপালের ভাগ্নে ছুঁলো না সেগুলো। বললো, এদেশে যতোদিন থাকবো ততোদিন দিশি খাবার খেতে মামা বারণ করে দিয়েছে। তাতে নাকি পয়সা বেশি খরচ হয় আর শরীরও ভালো থাকে না।

রতন ঠিক বুঝতে পারলো না কেন তাকে ভূপাল বলেছে একথা। তবু সে বললো, এটা তার মামার দোকান, কাজেই এখানে খরচ লাগবে না কিছু, আর ওই মিষ্টি খেলে শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না সুবোধের।

তখন ভূপালের ভাগ্নে সুবোধ নিমেষে প্লেট খালি করে দিয়ে বললো, আরও দিন। আইলীন ছুটে গিয়ে আরও সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে এলো তার জন্যে। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কখন সুবোধ তাকে ভূপালের খবর দেবে আর তার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে নিয়ে যাবার দিন ঠিক করবে। কিন্তু এসেই সুবোধ

কেমন করে বলবে সেকথা! কাজের কথা শেষ হয়ে গেলে হয়তো তাকে আড়ালে ডেকে একে একে সব জানাবে। আইলীন সেই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিলো।

রতনের সঙ্গে কাজের কথা শেষ করতে দেরি হলো না ভূপালের ভাগ্নের। ভূপাল সমস্ত হিসেব ভালো করে দেখতে বলেছে সুবোধকে, আর সম্ভব হলে সাত-আট দিনের মধ্যে গ্রীল বিক্রি করে টাকা পাঠাতে বলেছে। রতনের চিঠি সে বের করে দিলো। চিঠিতেও রতনকে সেই এক কথাই লিখেছে ভূপাল। হিসেব-পত্রের খাতা মন দিয়ে দেখতে লাগলো সুবোধ। রতন বললো, বিক্রির সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে রেখেছি, আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম সুবোধবাবু। আসবার আগে তো আপনি একটাও চিঠি দেন নি আমাদের —

না, মামা বারণ করেছিলো, হঠাৎ এসে পড়ে হিসেবের খাতা দেখতে বলেছিলো আমাকে।

ও, হেসে রতন বললো, তা কী দেখলেন, সব ঠিক আছে?

ঠিকই তো মনে হচ্ছে। তবে মামা বলেছিলো, যাই থাক না কেন বলবি খরচ একটু বেশি হচ্ছে।

রতন এবার হাসলো না। গম্ভীর হয়ে বললো, ও এই কথা বলেছেন!

এরা বাংলায় কথা বলছিলো। এক বর্ণ বুঝতে না পারলেও তাদের মুখ দেখে আইলীন প্রাণপণে কথার বিষয়-বস্তু ধরবার চেষ্টা করছিলো, আর, একবার সুবোধের মুখের দিকে একবার রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলো।

খাতা থেকে মাথা তুলে সুবোধ বললো, তা এবার তাহলে

বিক্রির বন্দোবস্ত করুন। কতোদিন লাগবে? দেরি হলে মামার কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আমার।

বেশি দেরি হবে না। শিগগিরই চুকে যাবে বলে মনে হয়। পিটার তো হাঁ করে বসে আছে আপনার অপেক্ষায়—

বেশ। কবে তার সঙ্গে দেখা করবো বলুন?

যেদিন আপনার খুশি। বলেন তো আজই ফোন করতে পারি?

না না আজ নয়। মামা আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। সেটা কোথায় আছে জানি না, একটু খুঁজতে হবে। চিঠি না দেখালে আমাকে সে টাকা দেবে কেন? বরং কাল সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করুন আমার।

বেশ, কাল সন্ধ্যেবেলা আসুন আপনি এখানে, আমি পিটারকে আসতে বলবো।

আচ্ছা, তাহলে এই ঠিক রইলো, উঠে দাঁড়িয়ে সুবোধ বললো, আজ আসি আমি।

নমস্কার করে রতন বললো, আসুন।

সুবোধ বেরিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু আইলীন ছুটে এসে তার পথ আটকে চুপে চুপে বললো, আমার চিঠি কই?

তোমার চিঠি?

হ্যাঁ, ভূপাল কোনো চিঠি দেয় নি আমাকে? আমার নাম আইলীন।

আইলীন, অবাক হয়ে সুবোধ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

আমার নাম কখনও শোনো নি তুমি?

না তো।

আমাকে বলবার জন্যে ভূপাল কোনো কথা বলে নি তোমাকে ?

না।

আচ্ছা তুমি যাও। সুবোধ বেরিয়ে যেতেই রতনকে বললো আইলীন, শোনো রটন্, এ কখনও ভূপালের ভাগ্নে নয়। ভূপালের ভাগ্নে আমার নাম শোনে নি এ কি হতে পারে ?

রতন হেসে বললো, চিয়ার্ আপ্ আইলীন—এমন কতো হয় !

কী বলছো তুমি ?

ভূপাল আর আসবে না, তোমার নামও করবে না কারুর কাছে কোনোদিন। আর যদি কখনও আসে তোমাকে চিনতেও পারবে না।

রটন্ তুমি বড়ো বাজে কথা বলো।

রতন হেসে জোরে আইলীনের পিঠ চাপড়ে আবার বললো, চিয়ার্ আপ্ আইলীন !

দিন কয়েকের মধ্যেই বেচা-কেনার ব্যাপার চুকে গেলো। টাকা নিয়ে টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে সুবোধ পাঠিয়ে দিলো মামাকে। তারপর এক লম্বা চিঠি লিখে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলো।

রতন আর একবার জিজ্ঞেস করেছিলো আইলীনকে, এখনও সময় আছে আইলীন, এসো তুমি আর আমি কিস্তিতে টাকা দিয়ে কিনে নি এ গ্রীল ?

ভূপাল নেই, তবু তুমি এ দোকানে আমাকে থাকতে বলো কেমন করে ?

কিন্তু সে তো আর আসবে না আইলীন।

মরা মানুষ হাসলে যেমন দেখায় তেমন করে হেসে আইলীন বললো, যদি ও কোনোদিনও না আসে তাহলে একদিন আমাকেই যেতে হবে ওর কাছে। আমি এখন থেকে তাই টাকা জমিয়ে যাবো। তবে আমি জানি ভূপাল আমার কাছে একদিন ফিরে আসবেই—আমি শুধু তারই অপেক্ষা করবো।

এখন কী করবে তুমি ?

ওয়েট্রেসের চাকরি আর করবো না। আপাতত মা-বাবার কাছে আমাদের গ্রামে গিয়ে থাকবো কিছুদিন।

তারপর ?

অতো কথা এখনও ভেবে দেখি নি রটন। হয়তো সাত সমুদ্র পার হয়ে যাবো তোমাদের দেশে। ভূপালের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হওয়া চাই-ই চাই।

রতনকে রাখতে চাইলো না পিটার। বললো, ইণ্ডিয়ান ওয়েটার আমার দরকার নেই, আমার স্ত্রী আর মেয়েরাই কাজ চালিয়ে নেবে। তবে আইলীন কাজ করতে চাইলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু আইলীন সে-অবসর দিলো না পিটারকে। ভূপালের স্মৃতি সম্বল করে নিঃশব্দে একদিন লণ্ডন ছেড়ে চলে গেলো তার মা-বাবার কাছে ডেভন্‌শায়ারে।

ইণ্ডিয়া গ্রীল নামটা রাখলো পিটার। সব যেখানকার তেমনি রইলো। চেয়ার-টেবিল সরিয়ে ঘরের কোনো অদল-বদল করলো না সে। শুধু রতন হলো বেকার !

কিন্তু রতন ভাবে না তার জন্যে। কিছু টাকা জমিয়েছে সে—তাতেই চলবে কিছুদিন। তার এখন একটু বিশ্রামের দরকার।

অনেক খেটেছে সে। অন্তত ক্ল্যারা আর বিষ্টু যে-কদিন রয়েছে সে-কদিন একটু হৈ-হৈ করা যাবে ওদের সঙ্গে। কি মনে করে ইণ্ডিয়া গ্রীল বিক্রি হয়ে যাবার কথা তাদের বলতে পারলো না রতন। চাকরি নেই—একথা বলতে কোথায় যেন বেধে গেলো তার। তাই বললো, তোমরা যে-কদিন আছো ছুটি নিয়েছি সে-কদিন।

কাজেই রতনের এখন প্রচুর অবসর। আর সময়টাও ভালো—রোদ্দুর ওঠে মাঝে মাঝে। বাড়িতে এখন রান্না-বান্নার পাট তুলে দিয়েছে ওরা। বিষ্টু বলে, আবার কবে ফিরে আসবো ঠিক নাই, অনেক করেছিস তোরা আমার বউ-এর জন্যে, চল এ-কটা দিন বাইরে খাই।

ক্ল্যারা, বিষ্টু আর রতন ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারাদিন। টাওয়ার হিল্ টিউব স্টেশনে নেমে টাওয়ার অব্ লণ্ডনে গেলো। সেখানে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে মণি-মুকুট বন্দুক-তলোয়ার দেখলো। মার্বল-আর্চে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে আইসক্রীম খেলো। পার্ক লেন ধরে ডর্চেস্টার হোটেলের পাশ দিয়ে এসে পড়লো গ্রীন পার্কের কাছে। পিকাডিলির দিকে রতন যেতে দিলে না ওদের—তার সব সময় ভয় পাছে ইণ্ডিয়া গ্রীলের কথা এরা জেনে ফেলে। ডান দিকে এগিয়ে গেলো হাইড পার্ক কর্নারের দিকে। সেণ্ট জর্জেস্ হাসপাতালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে এসে বসলো হাইড পার্কের বেঞ্চে। মার্বল-আর্চ থেকে দু-নম্বর বাস ধরে রিজেণ্টস্ পার্কে চিড়িয়াখানায় গেলো। বাঘ-সিংহের ঘরে এসে ওদেব দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো রতন। খাঁচার ওপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে, ফ্রম্ ইণ্ডিয়া। রতনকে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একে একে সব কটা বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন

করতে আরম্ভ করলো।

হেসে ক্ল্যারাকে বললো রতন, দেখো ক্ল্যারা, দেশের লোক দেখে ওরা আমাকে সেলাম জানাচ্ছে।

বন্দী বাঘ-সিংহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে রতন।

চলো, এক সময় ক্ল্যারা তার হাত ধরে টানলো, আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকেও অমনি খাঁচায় ভরে চিড়িয়াখানার কর্তারা লিখে রাখবে, ফ্রম্ ইণ্ডিয়া।

তারপর রেস্তোরাঁয় সাপার খেয়ে ওরা ছবি দেখতে গেলো। এমনি করে সেই কয়েকটা উজ্জ্বল দিন অতো তাড়াতাড়ি কোথা দিয়ে কেটে গেলো ওরা বুঝতেই পারলো না। যাবার দিন এসে গেলো। অথচ আজও ঘর খোঁজা হলো না—ওরা চলে যাবার পর এ বাড়িতে একদিনও কিছুতেই একা থাকতে পারবে না রতন। ওদের পৌঁছে দিতে যাবে সে। ওয়াটারলু স্টেশন অবধি নয়—একেবারে সাউদাম্প্টন বন্দর অবধি। জাহাজ থেকে যতোক্ষণ ওকে নামিয়ে না দেয় ততোক্ষণ 'ডকে' দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করবে। জাহাজ ছাড়লে যতোক্ষণ দেখা যায় ততোক্ষণ তাদের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়বে সে। আস্তে আস্তে সমুদ্রের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে একসময় অদৃশ্য হয়ে যাবে সেই বিরাট জাহাজ। তখন রতন এ বাড়িতে একা ফিরবে কেমন করে!

.

যাবার আগের দিন বিষ্টু ঘুমিয়ে পড়বার পর অনেক রাত্তিরে খুব আস্তে আস্তে রতনের দরজায় ধাক্কা দিলো ক্ল্যারা। বেশি রাত্তিরেও সহজে রতনের ঘুম আসে না কোনোদিন—আজও আসে নি। ও

জেগেই ছিলো। তবু শোনার ভুল ভেবে প্রথমে সাড়া দিলো না। আবার আর একটু জোরে শব্দ করলো ক্ল্যারা। আলো জ্বেলে দরজা খুলে অবাক হয়ে রতন ক্ল্যারাকে দেখলো। গায়ে তার নীল ড্রেসিং-গাউন।

কী ব্যাপার ক্ল্যারা ?

রতনের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে ক্ল্যারা হেসে বললো, কাল চলে যাবো তাই আজ নির্জনে দেখা করতে এলাম তোমার সঙ্গে।

অনেক ধন্যবাদ ক্ল্যারা। হয়তো এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

ওকথা বোলো না রটন, আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে তাহলে।

এতো দয়া ? হেসে রতন বললো, যাবার বেলায় আমাকে এতো দয়া দেখাচ্ছো কেন ক্ল্যারা ? কারুর কাছ থেকে দয়া পেতে আমি ভালোবাসি না যে।

ক্ল্যারা রতনের একটা হাত কোলের ওপর নিয়ে বললো, দয়া নয় রটন—

তবে ?

তুমি বোকা তাই—তাই দয়া বলে ভুল করো।

ক্ল্যারার কোলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রতন বললো, তবে কি প্রেম ? তুমি আমাকে ভালোবাসো না কি ? হেসে সে তাকালো ক্ল্যারার দিকে।

সে-কথার উত্তর দিলো না ক্ল্যারা। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

দেশ ছেড়ে যেতে তোমার খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ?

না, কিন্তু—

বলে যাও।

কিন্তু কেমন করে সেকথা তোমাকে বলবো রটন ?

কি কথা ? কেন বলতে পারবে না ? বলো ক্ল্যারা।

তোমাকে আমি ভয় করি রটন।

ভয় ? খুব জোরে হেসে উঠে রতন বললো, কিন্তু ঠিক এমনি এক রাত্তিরে যখন আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে, আমি কাউকে ভয় করি না, আই হেট্ ইউ—মনে পড়ে ক্ল্যারা ?

সে-রাত্তিরের কথা আমি কোনোদিনও ভুলবো না।

আমিও না। কিন্তু সে-রাত্তিরের কথা তুমি ভুলে যেও ক্ল্যারা। আর আমাকে মাপ কোরো।

রটন, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

কোথায় ?

ইণ্ডিয়ায়। বিষ্টুর মতো একটা চাকরি তোমারও জুটে যাবে। এখানে যেমন করে আমরা একসঙ্গে ছিলাম সেখানেও ঠিক তেমনি করে থাকবো।

আমি ভেবে দেখবো।

তোমাকে যেতেই হবে, ক্ল্যারা রতনের পাশে বসে তার হাত শক্ত করে ধরে মিনতি করলো।

এতোদিন আমাকে ডাকো নি কেন ক্ল্যারা ? কতোবার তোমাকে বলেছি, একদিন আমার সঙ্গে বেড়াতে চলো। কিন্তু বার বার তুমি আমাকে নিষ্ঠুরের মতো ফিরিয়ে দিয়েছো—

না রটন, তুমি ভুল করেছো, তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

ভুল আগে করতাম, কিন্তু আজকাল বোধ হয় আর করি না।

হ্যাঁ আজও করো। রটন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

যাবার বেলায় আমাকে এমন করে ডেকো না ক্ল্যারা। আমি যাবো না—যেতে পারবো না।

তুমি মূর্খ রটন, ক্ল্যারার গলা ভারী হয়ে উঠলো, কিছু বোঝো না, দয়া মায়া কিছু নেই তোমার।

হয়তো নেই।

তুমি জানো কেন আমি তোমাকে এতোদিন দূরে দূরে রেখেছি? বার বার ফিরিয়ে দিয়েছি?

না।

ভয়ে। আর একটু হলে সে-রাত্তিরে আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে বিষ্টুকে ফাঁকি দিতাম—তুমি আমাকে জয় করে নিতে পারতে—

আশ্চর্য হয়ে ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে রতন বললো, এ তুমি কী বলছো ক্ল্যারা?

ভয়ে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, দূরে দূরে রেখেছি সব সময়। সে-রাত্তিরে যখন তুমি বললে বিষ্টুর আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো না কেন—উঃ না সেকথা আজ আমি বলতে পারবো না, আমি কিছু জানি না—রতনের কোলে মাথা রাখলো ক্ল্যারা।

নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে রতন। ক্ল্যারার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনেক পরে সে বললো, একথা আমাকে দু-দিন আগে বললে না কেন ক্ল্যারা?

কেমন করে বলবো? বিষ্টুকে কেন ঠকাবো? তাই সব সময় ভান করেছি তোমাকে যেন আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে-রাত্তিরে আর একটু হলে—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ আমি ক্লান্ত রটন, তাই এসেছি তোমার কাছে—

কেঁদো না ক্ল্যারা।

রটন তোমার সঙ্গে আমার বিষ্টুর আগে দেখা হলো না কেন!

ক্ল্যারা?

কী?

এখনও সময় আছে—

কিসের সময়?

এক মিনিট কি ভেবে রতন বললো, বিষ্টুর সঙ্গে তুমি যেও না।

না না রটন ওকথা বোলো না—-আমাকে আরও দুর্বল করে দিও না—

ক্ল্যারা তুমি যেও না।

আমাকে যেতেই হবে।

আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

বিষ্টুকে ছাড়তে পারবো না আমি—

কিন্তু আমার কী হবে? কে দেখবে আমাকে?

তুমি চলো আমাদের সঙ্গে, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে।

ক্ল্যারার মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রতন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তুমি ঘরে যাও ক্ল্যারা। অনেকক্ষণ হলো, বিষ্টু জেগে উঠলে কী ভাববে?

তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না রটন?

তোমার যাও আগে, গুছিয়ে বসো, তারপর আমি যাবো বৈকি একদিন।

প্রতিজ্ঞা করো?

হেসে রতন বললো, করলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো ক্ল্যারা। তারপর একসময়ে গুড নাইট জানিয়ে নিজের ঘরে গেলো। বিষ্টু অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন।

রতনের কিন্তু আর ঘুম এলো না সে-রাত্তিরে। সারারাত জেগে শুধু একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে যেতে লাগলো। আর ভোরের আলো ঘরে এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে নেমে এলো ঘুম।

পরদিন হঠাৎ রতনের খেয়াল হলো, যাবার আগে ক্ল্যারাকে একটা ভালো উপহার দিতে হবে। বেচারী অনেক করেছে তাদের জন্য। কিন্তু কী কিনবে ভেবে পেলো না। ঠিক করলো বাইরে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে একটা পছন্দমতো জিনিস কিনে নেবে। ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে ট্রাঙ্ক খুললো সে। ব্যাঙ্কে কখনও টাকা রাখে না রতন। আগে ব্যাঙ্কে যাবার সময় ছিলো না তার। টাকা রাখে সে ট্রাঙ্কে, কাপড়ের তলায়। সে ভাবলো আজ একবার গুনে দেখবে কতো টাকা জমেছে তার।

কিন্তু যেখানে সে টাকা রাখে একটি নোটও নেই সেখানে। বাক্স তোলপাড় করে তুললো রতন। কিন্তু কোথায় টাকা!

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই। ঘণ্টা কয়েক পরে চলে যাবে ক্ল্যারা আর বিষ্টু। এখুনি বেরিয়ে পড়তে না পারলে কিছুই কেনা হবে না ক্ল্যারার জন্যে। তার পকেটে যা সামান্য টাকা আছে

অগত্যা তাই দিয়েই কিনতে হবে উপহার। পরে না হয় ভালো করে হারানো টাকার খোঁজ করলে চলবে। কাউকে কিছু না বলে নিচে নেমে এলো রতন।

রাস্তার বেরোবার দরজার কাছে এসে সে দেখলো একটা চিঠি পড়ে আছে। ফাঁক দিয়ে সকালবেলা যথারীতি ফেলে গেছে পোস্টম্যান। চিঠিটা তুলে নিলো রতন। খোকাবাবু লিখেছে দীনবন্ধুকে। পরের চিঠি খোলে না রতন। তাই সেটা পকেটে রেখে ভাবলো, যদি কোনোদিন দীনবন্ধু ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখে তাহলে এটা পাঠিয়ে দেবে তার কাছে।

হঠাৎ রতনের মনে পড়লো দীনবন্ধুর কথা। সে এখন কতোদূরে কে জানে!

অগতির গতি আলি সাহেব। এদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলে আলি যে ঠেকায় না পড়লে কেউ নাকি তার কাছে আসে না। আজও হাসতে হাসতে রতনকে সেই কথাই বললো সে। কোথাও তার থাকবার একখানি ঘর না পেয়ে রতন অবশেষে শরণ নিলো আলি সাহেবের।

তাই তো বলি হঠাৎ এতো সৌভাগ্য আমার হবে কেন!

ছি ছি আলি সাহেব, ওকথা বলবেন না। রোজ মনে করি আপনার কাছে আসবো কিন্তু আপনি তো বাড়িতেই থাকেন না।

থাক ভাই ওসব কথা। কিন্তু বাড়িতে যখন থাকি তখন? রাস্তা দিয়ে তো হনহন করে হেঁটে যাওয়া হয় দেখি?

ঘরের জন্যে মাথা খারাপ হবার যোগাড়, সকাল থেকে রাত্তির অবধি ছুটোছুটি করে নিরাশ হয়ে আপনার কাছে এসেছি আলি সাহেব।

এ বুদ্ধিটা আগে মাথায় আসলো না কেন? বলি আমি কি মরে গেছি?

জিব কেটে রতন বললো, আরে ছি ছি! কী যে বলেন! আপনি না থাকলে আমরা বাঁচবো কেমন করে?

থাক ভাই, মুখে বড়ো ভালোবাসা, কিন্তু—

এইবার দেখুন আলি সাহেব, এসে উঠি আপনার বাড়িতে, তখন দেখবেন কতো ভালোবাসি আপনাকে।

বেশ বেশ, ঘর যখন আছে আমার, তোমাদের কাজে লাগলে আমি খুশি হবো। হেসে আলি সাহেব বললো, তবে একটা কথা, ছোরা-টোরা নেই তো তোমার ?

অবাক হয়ে রতন বললো, ছোরা !

হাসতে হাসতে সে গণেশের গল্প বললো রতনকে। তার কথা আজও ভোলে নি আলি সাহেব।

সাতদিনের নোটিসে অল্ডগেটের বড়ো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রতন এসে উঠলো আলি সাহেবের ঘরে। দুটো ঘরই তাকে দিতে চেয়েছিলো আলি সাহেব। ভেবেছিলো রতন শিগগিরই বিয়ে করবে বলে তার ঘর ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু রতন জানালো আপাতত তার বিয়ের কোনো আশাই নেই। একটাতেই তার কাজ চলে যাবে। শুধু শুধু দুটো ঘর আটকে রেখে আলি সাহেবের অসুবিধা বাড়াতে চায় না সে। আর রান্না—রান্নার হ্যাঙ্গাম সে করতে চায় না, যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে খাওয়া-দাওয়া তাদের সঙ্গে করতে পারলে বেশি খুশি হবে রতন।

সে কথা শুনে আলি সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সে কি, তোমার হোটেল কী হলো ?

এবার আর রতন চেপে রাখতে পারলো না, ফস করে বলে ফেললো, বিক্রি হয়ে গেছে আমার চাকরি নেই এখন !

হুঁ, তাহলে কী করবে, চাকরি হবার আশা আছে কোথায়ও ?

এখনও খোঁজ করি নাই, বিশ্রাম করতে চাই কিছুদিন।

বেশ বেশ, কোনো ভাবনা কোরো না ভাই। যতো দিন বেঁচে আছি—কথা শেষ না করে আলি সাহেব হাসতে লাগলো।

এদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেলো রতনের। এইবার

একেবারে নিশ্চিন্ত হলো সে। আর কোনো ভাবনা নেই তার। সময়মতো আস্তে আস্তে একটা চাকরি খুঁজে নিলেই চলবে। কিন্তু সারাদিন রেস্তোরাঁয় বন্ধ হয়ে থাকবার ইচ্ছে আর নেই তার। বেড়াতে চায় সে। লণ্ডনে তেমন চাকরি কি কেউ দেবে না তাকে? কিন্তু সে-ভাবনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না রতন।

হ্যালো আঙ্কল্।

কী টিপু সুলতান?

সবাই চলে গেলো, তুমি যাবে না?

টিপু সুলতানকে কোলে তুলে নিয়ে রতন বললো, আমি চলে গেলে তোমাকে এমনি করে কোলে তুলে নেবে কে? এমনি করে আদর করবে কে?

সত্যি তুমি চিরকাল এখানে থাকবে?

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি টিপু সুলতান?

আন্টি এনো না কিন্তু আঙ্কল্। এক আন্টি তোমার ঘরে ছিলো, সে আমাকে মারতো, চকলেট দিতো না তোমার মতো।

তোমার ভয় নেই টিপু। আমি কখখনো আন্টি আনবো না। আসতে চাইলে ঘরে ঢুকতে দেবো না। আরও কতো চকলেট দেবো তোমাকে। চলো, বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

দাঁড়াও মা-কে বলে আসি, মা-র কাছে ছুটে চলে যায় টিপু সুলতান।

একটু পরে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রতনের সামনে এনে আলি সাহেবের স্ত্রী বলে, কোথায় নিয়ে যাবে একে? বড়ো দুষ্টু ছেলে, সারাক্ষণ বিরক্ত করবে তোমায়।

মার কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না আঙ্কল্। মা আমাকে একটুও

ভালোবাসে না কি-না তাই অমন কথা বলে। আমি খুব ভালো ছেলে হয়ে তোমার সঙ্গে বেড়াবো।

তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ে রতন। আবার সে চিড়িয়াখানায় যায় আর চুপ করে টিপুর সঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বাঘ-সিংহের খাঁচার সামনে। কিন্তু দেশের লোক বলে আজ আর রতনকে চিনতে পারে না ওরা—তেমন করে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে অভিনন্দনও জানায় না। ওরাও যেন ঝিমিয়ে গেছে।

রাত্তির বেলা খাবার পর অনেকক্ষণ গল্প করে ওরা তিনজন। দেশের নানা আলোচনা হয়। দেশ থেকে নতুন কেউ এলে তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নানা খবর জিজ্ঞেস করে আলি সাহেব। আর মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলে টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়ে রতনকে বলে, এই দেখো বেঙ্গল, ওই যে আসাম, আর এই তো দেখছো সিলেট। এইখানে আমার বাড়ি রতন—

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রতনের মনে হয় হাতের কাছে তার দেশ—নিমেষে সেখানে পৌঁছতে পারে সে।

দেশে যাওয়ার কিছু ঠিক করেছেন নাকি আলি সাহেব?

যাবো বৈকি, যাবো। এখন তো তুমি রইলে আর ভাবনা কী আমার। তবে ব্যবসা জমে উঠেছে এখানে, এই বয়সে দেশে গিয়ে নতুন করে তো কিছু শুরু করতে পারবো না। খালি স্ত্রীকে তার শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়ে আনতেই হবে একবার কিছুদিনের জন্যে—

কবে নিয়ে যাবে তুমি? ব্যস্ত হয়ে স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, এখন তো রটন আছে, কাজও নেই ওর কিছু, ও তোমার বাড়ি ব্যবসা দুই-ই দেখতে পারে।

ঠিক ঠিক। কিছু যদি মনে না করো রতন, একটা কথা বলি।

আপনার কথায় কিছু মনে করতে পারি আমি আলি সাহেব ?

একটি বিশ্বাসী লোকের দরকার আমার, লণ্ডনের সব পাড়ায় ঘুবে ঘুরে মণি-মুক্তা বিক্রি করবার জন্যে। চেহারা ভালো তোমার, আর ওয়েস্ট এণ্ডের রেস্তোরাঁয় কাজ করেছো তুমি—কতো লোককে চেনো।

খুব খুশি হয়ে রতন বললো, আমাব বড়ো উপকার করবেন। অমন কাজ পেলে আমার ভাগ্য বলে মনে করবো।

মাইনে তোমার যা—

যা হয় দেবেন, আপনার সঙ্গে দরাদবি নাই আমার।

মাইনে ছাড়া কমিশনও পাবে তুমি।

না পেলেও কোনো ক্ষতি নাই আলি সাহেব।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আলি সাহেব বলে, ব্যস্ নিশ্চিন্ত, এইবার তোমাকে সত্যি তোমার শ্বশুববাড়ি ঘুবিয়ে আনবো।

তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ বতন, এতোদিন বিয়ে হলো অথচ স্বামীব দেশ দেখলাম না এখনও।

আব রতন ভাবে অগতিব গতি আলি সাহেব সত্যি গতি করে দিলো তার।

আবার লণ্ডন চষে বেড়ায় রতন। লিভারপুল স্ট্রীট থেকে সে যায় ইলিঙ্ ব্রডওয়ে, হাউন্স্লো থেকে ককফস্টাব, স্টানমোর থেকে এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেল্।

গ্রীষ্মকালে টিউবে চড়ে না রতন। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে বাস থামায়। তাবপর দোতলায় উঠে বসে পড়ে। কোথায় যাবে জানে না। কণ্ডাক্টার এসে টিকিটের দাম চাইলে চোখ

বুঁজে বলে থ্রি হে পেন্স্ প্লিজ। কণ্ডাক্টার কী চেঞ্জ ফিরিয়ে দিলো তা না দেখেই পকেটে ফেলে তোতাপাখির মতো বলে, থ্যাঙ্ক ইউ। অতো শাদা লোকের ভিড়ে একমাত্র ভারতীয় রতনের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখে, কিন্তু সে তাকায় না কোনো দিকে। মাথা নিচু করে দেড় পেনি দামের খবরের কাগজে মন দেবার চেষ্টা করে। রোদ উঠলে নকল মণি-মুক্তোর বাক্স হাতে নিয়ে কোনো পার্কের বেঞ্চিতে গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সে। আজও মাঝে মাঝে মেয়ে এসে বসে তার পাশে। তাড়াতাড়ি রতন দূরে সরে যায়। কিছুক্ষণ পর আলাপ করবার ছলে ব্যাগ থেকে সিগ্রেট বের করে মেয়েটি দেশলাই চায় তার কাছে। পকেটে দেশলাই থাকলেও ঘনিষ্ঠতা হবার ভয়ে রতন বলে, দুঃখিত, দেশলাই নেই আমার কাছে। একটু পরে আস্তে আস্তে উঠে যায় সেখান থেকে। কোনো কোনো দিন পিকাডিলির চারপাশে ঘুরে বেড়ালেও ইরসের মূর্তির দিকে মাথা তুলে আর তাকায় না সে।

শীতকালে তুষারের দিনে সম্ভব হলে বাড়ি থেকে বেরোয় না রতন। আর যদি একান্তই বেরোতে হয় তাহলে ওভার কোটের কলার ভালো করে তুলে ছুটে গিয়ে টিউব ধরে। নিউমোনিয়ার বড়ো ভয় তার আজকাল।

আর তখন কি কেউ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় রতনের মনের নিবিড়ে? কালো রঙ তার, লম্বা লম্বা চুল, আঁটসাঁট দেহের বাঁধন আর টানা-টানা চোখ—তার এতোদিনের সোনা বউ। তার কথা আর ভাবে না রতন।

তবু ফিসফিস রিমঝিম তুষার ঝরে।
